মন না মতি

সন্তোষ ঢালী

সন্তোষ ঢালী এসময়ের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক। নিয়মিত লিখছেন গল্প, কবিতা, ছড়া, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস **অচেনা মানুষ। মন না মতি** তাঁর প্রথম উপন্যাস। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ।

মানুষের মন বড় জটিল। বিচিত্র তার গতি। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণ এ উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত সাধন। তার মনে হয়, সবাই তাকে উপহাস করে। মাছিও তাকে মৃত মনে করে নাকের মধ্যে ঢুকে যায়। ইঁদুর-বিড়াল তাকে তোয়াক্কা করে না। মনটা তার স্থির না। জগাই ছিল ভণ্ড সাধু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যায় করতেও সাহস পেত না। সময়ের ধাক্কায় সে একাত্তরের রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা। পাশের গ্রামের তপন ভালোবাসত শ্যামলীকে। যুদ্ধের ডামাডোলে দু'জন বিচ্ছিন্ন। তপন যায় যুদ্ধে। শ্যামলী নিখোঁজ। যুদ্ধ শেষ হয়। হারিয়ে যায় স্বজন। সেই থেকে শ্যামলীকে তপনের অনন্ত খোঁজা। শেষ হয় না খোঁজা। মিলল কি শ্যামলী? রহস্যাবৃতই থেকে যায় তাদের মিলন। মনের এই বিচিত্র গতিপ্রকৃতি নিয়ে সাবলীল ভাষায় লেখা রূপকাশ্রয়ী এ কাহিনি অবশ্যই ভিন্ন স্বাদের দাবিদার। **সন্তোষ ঢালীর** এ উপন্যাস পাঠকদের সমাদর পাবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

– অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

উপাচার্য

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

মন না মতি

(উপন্যাস)

সন্তোষ ঢালী

গ্রন্থ কুটির

মন না মতি

সন্তোষ ঢালী

প্রকাশকাল	:	বইমেলা, ২০১৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
প্রকাশক	:	রতন চন্দ্র পাল
		গ্রন্থ কুটির
		২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
গ্রন্থস্বত্ব	:	সূনৃত ঢালী সপ্তক
প্রচ্ছদ	:	মাহমুদুর রহমান
বর্ণবিন্যাস	:	রিপন বিশ্বাস
মুদ্রণ	:	দিকদর্শন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
পরিবেশক	:	দিকদর্শন প্রকাশনী লি. ২৬ বাংলাবাজার,
		আলীরেজা মার্কেট (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
		ফোন : ০২-৪৭১১৫৬১৮, ০১৭১২-১১৯৩১৮।
মূল্য	:	১৬০ টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-21-0250-9

দু'টো কথা

'মন না মতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। একুশে বইমেলায়। সিটি লাইব্রেরি থেকে। বইটি প্রকাশে প্রযত্নের অভাব ছিল প্রকাশকের। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী সমর মজুমদার। পরিবেশনার কারণে খুব বেশি পাঠকের হাতে পৌঁছায় নি বইটি। তবে ভরসার কথা– অসম্ভব পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে উপন্যাসটি। যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সবাই প্রশংসা করেছেন। 'ভারত বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক নান্টু রায় 'পরমা'র শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।
উপন্যাসটি বাজারে না থাকায় এবং পাঠকের চাহিদার কারণে আবার প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করি। পাঠকের সমালোচনা ও অকুণ্ঠ ভালোবাসাই আমার পাথেয়।

– সন্তোষ ঢালী
একুশে বইমেলা ২০১৯

স্বপ্নীল নীলের খোঁজে
(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

যে বোধ নক্ষত্র হয়ে জ্বলে শূন্যের নীলে, কে ছোঁয়া সে আগুনপাখি। আছে তার ওড়ার আকাশ মুক্ত মনে। ঝলসানো ডানায় সে ফিনিক্সের সুরে ফিরে পায় নতুন জীবন স্বপ্নীল নীলে। পৃথিবী তৃষিত হয়, আকাশ ঝরায় বৃষ্টি। সবুজ হয়, স্বপ্নীল নীলের ছোঁয়ায়। মরুকে চিনে নিতে ভুল হয় না জলপ্রপাতের। কারণ, তৃষ্ণা জাগানিয়াই তো মেটায় অনন্ত পিপাসা।

বিচিত্র এই জগৎ। বিচিত্র জগতের মানুষ। বিচিত্র মানুষের মন। মন যেন মেহেন্দি পাতা। সবুজ। চটকালেই রঙিন। মনের সম্পূর্ণ পরিচয় পায় না মানুষ। তাই এর নাগাল পাওয়াও ভার। মানুষ প্রহেলিকাময়। তারও চেয়ে প্রহেলিকাময় মন। জটিল। দু'টো মন কখনওই এক হয় না সম্পূর্ণ। বরং এক মনই হয় বিভিন্ন। আর তাই বাধে গোল। সন্দেহপ্রবণ মানুষের মন। অনর্থক সন্দেহ মানুষের জীবনে বয়ে আনে ভয়াবহ অশান্তি। যেহেতু পরিবর্তনশীল মন, তাই পরিবর্তনশীল তার চাওয়া-পাওয়াও। এ সবই এ কাহিনির বিষয়। বাস্তবতার ছোঁয়া থাকলেও ছায়া নেই এ গল্পে।

যার ব্যস্ত তাগাদায় বইটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো, সে হচ্ছে সুমনা, আমার সব সময়ের সাথি। নানাভাবে মতামত দিয়ে আমাকে উৎসাহ যোগিয়েছে বন্ধু এ্যাডভোকেট শৈলেন্দ্র নাথ হালদার। সহযোগিতা করেছে উর্বি ও জীবন। আমার বন্ধু দম্পতি। প্রবাসী। সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল আমার দুই ছাত্র জীবন ও জাহিদ। একটু আন্তরিকতায় ছোঁয়া ছাড়া কী ই বা দেয়ার আছে আমার।

সার্থকতার সীমানা জানে না সাহিত্য। বইটি পাঠে পাঠক আনন্দ পেলেই প্রচেষ্টা প্রত্যয়ী হবে। সকলকে শুভেচ্ছা। সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায়।

শ্রাবণ
তুরাগের তীর

আমার বাবা

যিনি আজ শুধুই স্মৃতি

নিয়ত রক্তে বাজেন তবু

মন আমার জ্ঞানধনুকে মারিল টঙ্কার
হৃদয়-বীণার সব তারেতে লাগিল ঝংকার

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মহা ভাবনায় পড়ে গেল জগাই। সব কিছু দেখেশুনে কেমন এক দুর্বিপাকে পড়ে যায়। বড় জটিল মনে হয় সব কিছু। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার ত্রিধারা স্রোত মিলে যেমন বীভৎস ঘোলাটে হয়ে ওঠে জল, তার চেয়েও। সবচেয়ে জটিল মানুষের মন। মন তো নয় যেন ম্যাজেন্টার গুঁড়া। এক জায়গায় থাকে তো নীলচে সবুজ। ছড়ালেই লাল। ভিজালেই রঙিন আলো। আলোর খেলা। মন যেন প্রিযম। ত্রিকোণ কাচ। তাকাও। সূর্যের সাত রঙের খেলা। রঙধনু। মন যেন রঙধনু। একে বিশ্বাস করা কঠিন। শালা কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। নিজেকেও না। জগতের পাঁচশো কোটি মানুষের মন পাঁচশো কোটিরও বেশি। জগাই ভাবে। হিসেব করে দেখে, শালা সাড়ে বারোশো কোটির কম নয়। কারণ, দু'টো করে মন প্রত্যেকেরই আছে। একটা 'হ্যাঁ'। আর একটা 'না'। আর একটা 'হ্যাঁ' ও না, 'না' ও না। এ দু'টোর মাঝামাঝি। তাতে গড়-পরতায় মানুষপ্রতি আড়াইটে করে মন ধরে নিয়ে এক মহা সমস্যায় পড়ে যায় জগাই। এমন দুর্বিপাকে সে পড়ে নি কখনও। মুস্কিল। আরও ভাবে– নামটা অবশ্য বাপ-ঠাকুরদা রেখেছিল জগদানন্দ। কবে এবং কেন যে ক্ষয় হ'তে হ'তে শর্ট-কাট হয়ে জগাই হয়ে গেল, সে ইতিহাস লেখাও নেই; আর মনেও নেই। তবে মাঝে মাঝে মনে হতো– জগাই-মাধাই মাতাল ছিল। গাঁজা-ভাং খেতো। সে-ও তো গাঁজা-ভাং খায়। সেই সূত্র ধরেই লোকে হয়ত জগাই বলে ডাকে। ডাকুক শালারা। লোকদের উপর তার ঘৃণা চড়ে যায়। বলে ওঠে– আরে ব্যাটারা, মাতাল হই কি সাধে? মাতাল হলে জগৎ পরিষ্কার দেখি। দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। টান হয়ে ওঠে জ্ঞান ধনুকের ছিলা। ভাবে। ভাবে– সুন্দর একটা ভাবনা আসছে তো মাথায়? জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভাবি।

তিরিক করে লাফিয়ে ওঠে জগাই। বলে ওঠে জগাই– ইউরেকা, ইউরেকা; জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে ভাবি বলেই লোকে আমাকে জগাই বলে। চমৎকার। তবে মাঝে মাঝে 'জগা' বলে কেন?

আবার ভাবে– জগে জল থাকে। আমাতে জ্ঞান থাকে। জগ জল দেয়। আমি জ্ঞান দিই– এজন্যই মানুষ হয়ত জগের সাথে আমার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। মনে বেশ ভালো লাগে। আবার প্রশ্ন জাগে– তবে যে ভ্যাবা জগাই বলে? আবার ভ্যাগাইও বলে? বুঝতে না পেরে আখড়ায় চলে যায়। কারও সাথে কোনো কথা না বলে কল্কেতে গাঁজা পুরে আগুন দিয়ে দু'টান দিতেই সব পরিষ্কার– বেশি ভাবে বলেই লোকে তাকে ভ্যাবা জগাই বলে। তবে ভ্যাগাই বলে কেন? এটার অর্থ পরিষ্কার হলো না। আবার কষে এক টান। তারপর দম মেরে বসে থাকা। গাঁজাকে এরা গঞ্জিকা না বলে প্রসাদ বলে। জগাই বলে Eraser, পেন্সিলের লেখা মোছার রাবার। মাথায় যত অচিন্তা, বিচিন্তা, কুচিন্তা, সুচিন্তা, দুশ্চিন্তা থাকুক সব মুঝে দেবে। তখন ব্রেইনটা একদম কোরাকাগজ। সাদাকাগজ। পরিষ্কার। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তের ব্রেইন। নির্ভেজাল। অনেকক্ষণ ভাবল জগাই। কাজ হলো না। ধরে নিল ওই ভাবনা থেকেই এটারও উৎপত্তি। ভ্যাবারই অপভ্রংশ। জগৎ সম্বন্ধে এত ভাবে বলেই তো এতটা নাম তার?

কথা সেটা নয়। কথা হলো জগৎ এবং জীবন নিয়ে। মানুষের মন নিয়ে মানুষকে বিশ্বাস করা নিয়ে। কী করে করবে বিশ্বাস? নিজেকেই বিশ্বাস করা যায় না? লোকেরা তো তাকে ছোটখাটো সাধুও ভাবে? নিজেকেও নিজে সাধু ভাবে। আবার ভাবেও না। মাঝে মাঝে মনে হয়– আসলে সে একটা শয়তান। মিচ্‌কে শয়তান। ভণ্ড। আবার ভাবে– কে না শয়তান? কে না ভণ্ড? জগতের সবাই ভণ্ড। সবাই অভিনয় করে চলছে। পরের সাথে। নিজের সাথে। ভেতরে ভেতরে সব এক। একই ছাঁচের পিঠা। উপরে ভালো। ভেতরে ফুটো। উপর দিয়ে ফিটফাট, তল দিয়ে সদরঘাট। জগাইর মনে হয়, মন তার মোটে আড়াইটা নয়। তারও বেশি। চারটা তো হবেই। সাড়ে চার, পৌনে পাঁচটাও হতে পারে। এক মনে বলে 'হ্যাঁ'। এক মনে বলে 'না'। এক মনে দু'টোর মাঝামাঝি। এক মনে কোনোটাই না। আর একটা মন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চঞ্চল বাতাসের মতো। ঢুকে পড়ে যেখানে সেখানে। ফুড়ুৎ। মন যেন চড়ুই পাখি। এই তো সেদিন শিষ্যবাড়ি যাবে বলে রওনা দিল। কিছুদূর যেতে না যেতেই মনটা 'না' গাইতে শুরু করল। পুকুরপাড়ে তার আখড়া। শুদ্ধ বাংলায় আশ্রম। ফিরতে না ফিরতে ফিরতেও ইচ্ছে করল না। সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ঝপ্ করে বসে পড়ল পুকুরপাড়েই গ্যাট হ'য়ে। অন্য কোথাও ইচ্ছে করছে না যেতে। জগাই হলো শিবের সাধক। নিজের প্রচার। গাঁজা টানে বলেই হয়ত। গলায় কেজিদুই ওজনের রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে সিঁদুর। বাঁ-হাতে ত্রিশূল। ডান-হাতে চিমটি। জটা হয় নি বলে ধুলো মাখিয়ে মাখিয়ে উকুনের আড্ডাখানা করেছে। ছারপোকাও থাকতে পারে দু'চারটে। কৌপিন একটা আছে অবশ্য। তবে তার তলে জাঙ্গিয়া পরা। বাঘের ছাল তো পাওয়া যায় না? তাই খাটাসের ছাল দিয়ে তৈরি। আসনটা অবশ্য ছাগলের ছাল। তবে কখনও কখনও বলে কৌপিনটাও ছেড়ে দেবে! সাহস পায় না। কারণ, মনকে যতই বুঝাক না কেন, ফাঁক-ফোকর দিয়ে খাঁচার পাখি বনে উড়াল মারেই। ভাবে– মেয়ে হলে এতদিনে কৌপিন সে ছাড়তই। তাহলে তো আর ভেতরের খবর বাইরে প্রকাশ পেত না। এদিক দিয়ে বেশ ভালো আছে মেয়েরা।

একদিন কোথা থেকে যেন আর এক সাধু এসে হাজির গ্রামে। জগাইয়ের চ্যালারা– ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়, সুখঞ্জয়, দুখঞ্জয় মিলে ধরে নিয়ে এলো তাকে। জগাই বলল– শালা, সাধুগিরি দেখাতে আসছে এখানে? আমি যা যা পারি, তুই পারিস্ তা?

– পারি।

– আমি যা যা খেতে পারি, তুই পারিস্ তা খেতে?

– পারি।
অমনি জগাই হুঙ্কার ছাড়ল– এই ধনা, যা তো কতগুলা শামুক তুলে নিয়ে আয় পুকুর থিকা।
বলতে দেরি আছে, করতে দেরি নেই। নিয়ে এলো। আদেশ দিল জগাই– মুখ খুলে গিতা বাইর কর।
গিতা হলো ভেতরের মাংসল পদার্থ। বের করল। এবারে সাধুর দিকে তাকিয়ে বলল– খা শালা। দেখি কেমন সাধু তুই?
খেতে অসম্মতি জানাল সাধু।
– গিতা কেউ খায় নাকি যে আমি খাবো? আমি পারিবো না।
– পারবো না? তুই তো পারবিই, তোর শ্বশুরেও পারবে। তোর বাপ পারবে। তোর তালই পারবে। তোর চৌদ্দ পুরুষ পারবে। শালা ভগবান সাজছে?
– মানুষে যা না খায়, আমি তা ক্যান খাবো?
– আমি মানুষ না? ক্যান, আমি যা পারি তুইও বলে তা পারিস? দেখি ক্যামোন পারিস্? শালা, দ্যাখ।
এই বলে কৎকৎ করে জগাই তিন-চারটা শামুকের গিতা খেয়ে ফেলল। মনে হচ্ছিল রসগোল্লা খাচ্ছে। সাধু তা দেখে কেঁদে দেয় প্রায়। এবারে চ্যালারা চেপে ধরেছে সাধুকে। না খাইয়ে ছাড়বে না। শেষে পা ধরে কেঁদে পড়ে যখন ক্ষমা চাইল, তখনই সে ছাড়া পেল। এরপর জগাইর একজন অন্যতম শিষ্য হয়ে গেল সাধু। তার নব নামকরণ করা হলো গিতাঞ্জয়।
সে যা হোক, পুকুরপাড়ে বসে পড়েই স্থির হয়ে থাকল জগাই। যেন পাথুরে মূর্তি । ঠুটো জগন্নাথ। চোখ বন্ধ। মেরুদণ্ড তালগাছের মতো সোজা। হাত দু'টো সামনে প্রসারিত। যেন তারাপীঠের সাধু। শবসাধনায় রত। রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকির মতো। যেহেতু বল্মীক নেই এখানে এবং সামনেই জল তাই জগাইকে আমরা 'জল্মীকি' ঋষি বলতে পারি। ভাবল– একটু সাধনা করা যাক। বড় শক্তিশালী সাধনা। বেশিক্ষণ চোখ বুঁজে থাকতে পারে না জগাই। একটু ফাঁক হয়ে গেল চোখ। কয়েকটা মন্ত্র আওড়াতেই পুকুরের অপর পারে ঘাটলায় কলসি কাঁখে দুর্গা এসে হাজির। ঝড়ুগোপালের বউ। গায়ে বেশ মাংস আছে মাগির। (মাগিটা সাধু-সন্ন্যাসীর ভাষা বলেই ওটা বলে জগাই)। চেহারাটা দেখতে দুর্গার মতো। জগাই মনে মনে নিজেকে শিব ভাবে। অন্য মনটা ধমক দেয়– জগাই, তুমি না সাধু, ধ্যানে বসেছো, সাধনা করবে? এ কী স্বভাব?
তখন ঝুপ্ করে চোখ বোঁজে। কিন্তু, বেশিক্ষণ আটকে থাকে না চোখ। ঘটাং করে খুলে যায়। মনে হয় স্প্রিং লাগানো। কে যেন ঠেলে খুলে দেয়।
পড়ন্ত বিকেল তখন। বউটা গা ধোবে। এক চোখ সামান্য ফাঁক করে ট্যারা ভাবে দেখতে থাকে জগাই। আর 'হর হর ব্যোম' বলতে থাকে। এ সময় পুকুরের ঘাটটা অবশ্য একটু নির্জনই থাকে। বউটা তার ব্লাউজ খুলছে। ইস্, ঝপ্ করে চোখটা বন্ধ করে আবার খুলে দেয় জগাই। বউটার লজ্জাও নাই। লোক না থাক, গাছ তো আছে? গাছে পাখিও তো আছে? তাছাড় জগাই? হোক সে সাধু? বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে উদাম মনে ব্লাউজটা খুলতেই পানিভরা রঙিন বেলুনের মতো দু'টো কী যেন বেরিয়ে পড়ল। 'হর হর ব্যোম ব্যোম' বলে ঝপ্ করে চোখ বুঁজল জগাই। যেন মানস সরোবরে স্নানে নেমেছে স্বর্গের অপ্সরী। মেনকা কিংবা উর্বশী। ধ্যান ভাঙাবে বিষ্ণু কিংবা বিশ্বামিত্রের।
জগাই মনকে বুঝায়– তুমি সাধু, তাকিও না ওদিকে।
অন্যমন বলে– দোষ কী? চোখ দিয়েছেন সৌন্দর্য অনুভব করতে? সৌন্দর্য দিয়েছেন যিনিরে মন, চোখ দিয়েছেন তিনি । ফুল ফুটবে, কোনো অলি তবু আসবে না, সে তো হয় না।
মন বলে– ওটা আদিম সৌন্দর্য।
অন্যমন– তাই বলে দেখব না?
তৃতীয় মন– অত সরাসরি কী দরকার?
চতুর্থ মন– বিয়ে করে দেখতে পার না?
পঞ্চম মন– এ তো চোখের দেখা, দেখলেই তো আর ক্ষয়ে যাচ্ছে না?
বাকি মনটা বলে– সাধুদের বিয়ে করতে নেই। ওভাবে দেখাটাও অশ্লীল। ডুবে ডুবে জল খাওয়া পাপ। বরং প্রত্যেকের ভেতরে নগ্নতা আছে। কাউকেই কাপড় পরে পাঠায় নি ঈশ্বর। সবাই-ই ল্যাংটা হয়ে জন্মায়। কেউই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে জন্মায় না। তারপর ধীরে ধীরে বড় হয়, কবে বড় হয়, তাও টের পায় না। নতুন কিছু গজায় না; যা থাকে তাই-ই শুধু বাড়ে। পরে কাপড় ধরে। আর লজ্জা এসে ভিড় করে। কাপড় পরলেও ভেতরটা তো ল্যাংটাই থাকে সবার; তবে তা চোখে দেখতে দোষটা কী? জগতের সমস্ত নর-নারীকে এ মুহূর্তে ল্যাংটা দেখতে পায় জগাই। মেঘের মতো কাপড়ও হাওয়ায় উড়ছে। ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। উদাস। Blue world. কাপড়ের অন্তরালে হেঁটে বেড়াচ্ছে মানুষগুলো। ল্যাংটা। কেউ অফিস করছে। কেউ চাষ করছে। কেউ হাঁটছে। ল্যাংটা। শিক্ষক পড়াচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রী পড়ছে। ল্যাংটা। নেতা বক্তৃতা করছে জনসভায়। ল্যাংটা। দর্শকরা ল্যাংটা। সবাই, সবই ল্যাংটা। ভীষণ লজ্জা লাগল জগাইর। সবাই ল্যাংটা ভোঁদর। বান্দরের ছাও। ঝপাৎ করে বাঁ-হাত দিয়ে কৌপিনটা ভালোভাবে ধরে দেখল– সেও ল্যাংটা হয়ে গেছে কিনা।
গা ডলছে বউটা। বুক জলে ভাসছে দু'টো রঙিন বেলুন। কী সুন্দর! যদিও এইমাত্র সে পৃথিবীর সবাইকে ল্যাংটা দেখে আসছে; তবুও এই বাস্তব দেখায় যেন কী এক, কেমন এক মোহ আছে। চুড়ই পাখির মতো তিরিক তিরিক করে ওঠে ভেতরটা। ঢিব্‌ঢিব্ করতে থাকে বুক। অস্ফুট স্বরে বলে– 'হর হর ব্যোম ব্যোম'। চোখ মেলে যখন তাকাল, দেখতে পেল– জলভরা কলসি কাঁখে চলে

যাচ্ছে বউটা। সারাদেহে লেপ্টে আছে ভেজা কাপড়। গৌরীই যেন জল নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে চলে। আর হিমালয়ের উপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে মহাদেব।

গায়ের জোরে গরু হওয়া যায়,
গুরু হওয়া যায় না

জগাই যখন গাঁজায় টান দেয়, তখন তার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। ভগবানের সৃষ্টির কিছু ভুল ধরা পড়ে। এই যেমন, মানুষকে ল্যাংটা করে জন্মানো উচিত? কী লজ্জার? রাজাদেরও ল্যাংটা করে জন্মায়। প্রজাদেরও। এটা ঠিক নয়। অন্ততঃ একটা কাপড় বা তেনা জড়িয়ে জন্মাতে পারত। তাতে মহাভারত অশুদ্ধি হতো না? এই সেদিন ভিজে কাপড়ে যেমন বউটা গেল। নয়ত ছোট হাফ-প্যান্ট অথবা একটা জাঙ্গিয়া পরিয়েও মানুষকে জন্মাতে পারত? মেয়েদের একটু সমস্যা। গাঁজায় দু'টো টান মারে। কোনো সমস্যাই না। একটা জাঙ্গিয়া– আর একটা কী যেন, কী যেন বলে? বুকে বাঁধে? ধুর ছাই, মনে নাই– তাই দিলেই হলো। মেয়েদের যে দু'টো লজ্জাস্থান? ভগবানের এ ভুল শোধরানো দরকার। ভাবল– ভগবানকে একটা চিঠি লিখবে।

তারপর এই চোখের ব্যাপারটা। এমন এক জায়গাতে দু'টো চোখ যাতে সবদিক দেখা যায় না একসাথে। তাছাড়া এক চোখ অন্য চোখটাকে কোনোদিন পায় না দেখতে। এত কাছে অথচ কত দূরে? প্রেমিকার মতো। বুকে বুক মিলিয়েও সুখ নেই। মনে হয় কত দূর। আরও কাছে আসত? একেবারে বুকের ভেতরে সেঁধিয়ে ফেলা যেত? তাহলে দূরত্ব কমত। দু'টো চোখ নাকের মাথায় হলে। অবশ্য নাকটা আর একটু উঁচু ও লম্বা হওয়া দরকার ছিল। অন্য চোখটা বাঁ হাতের তর্জনীয় ডগায়। টর্চ লাইটের মতো সামনে পেছনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নাও বাবা। গলায় কাঁটা বিঁধেছে? দেখে নাও কোথায়। পিঠে ঘামাচি? দেখে নাও কোন জায়গায়। মলদ্বারে জটিলতা? দেখে নাও। পেটে বাচ্চা? দেখে নাও ছেলে কি মেয়ে। সুশ্রী কি কুশ্রী। কত সুবিধে। রাস্তা চলছ? পেছনে ট্রাক? দেখে সাবধান হও। চোখের পরিকল্পনাটায়ও ঈশ্বরের ত্রুটি রয়েছে।
আর একটা কাজ মোটেই ঠিক করেন নি ঈশ্বর। সেটা হলো ক্ষিধে। ক্ষিধে না থাকলে সব ল্যাঠা চুকে যেত। এই ধান্দামি, বাটপারি সব। বসে বসে শুধু মহাদেবের ধ্যান। মেয়েরাও? অমনি ভেতরটা তার তিরিক করে লাফিয়ে ওঠে। ভাবে– মেয়েরা কোন জাতরে শালা? মনে পড়লেই তিরিক করে ওঠে ভেতরটা। ভাবে এই আর একটা ভুল। তিরিক ভাবটাও দেয়া উচিত হয় নি। তাহলে কৌপিনটা অন্ততঃ ছাড়তে পারতাম। এই সেদিন সে কেবল ধ্যানে বসেছে, অমনি তিরিকভাবে লেগে কোথা থেকে দু'টো কুকুর ওর সামনে এসে হাজির। চোখ খুলতেই তারও তিরিক করে উঠল ভেতরটা। শালা তিরিক ভাবটা না দিলে ভালো হতো। ধ্যান আর ধ্যান। তাই বলে মেয়েদের মহাদেবের ধ্যান ঠিক হবে না। সেটা ছোটলোকি কারবার। তারা করবে দুর্গার ধ্যান। নয়ত মা কালীর। মা কালীর ধ্যানই ভালো। কারণ, ভেতরে ভেতরে সবাই-ই তো মা কালী।
বুঝে উঠতে পারে না জগাই কোনটা সঠিক পথ? কোন্‌টা ঠিক? কোন্‌টা বেঠিক। এক মনে একটা বলে, অন্য মনটা ঈর্ষায় জ্বলে। বীজগণিতের সূত্রের মতো সব কেন মিলে যায় না? স্কুলজীবনে বীজগণিতই ছিল তার প্রিয় বিষয়। প্রেমে পড়েছিল একটা মেয়ের। মেয়েটা ল্যাজে ঘুরিয়ে ছেড়েছে তাকে। গাদা গাদা স্নো-পাউডার গচ্চা গেছে। হাতে ধরে বীজগণিত শিখিয়েছে। কিন্তু প্রেমের বীজগণিত শেখাতে পারে নি সে। বীজগণিতের প্যাঁচে মজে নি মেয়েটি। জীবনের বীজগণিত মেলে নি তার কোনো সূত্রে। একটিবারের জন্য তাকে ছুঁতেও দেয় নি। প্রেমপত্র লিখত। কত কী লিখত? মনে পড়লে বুকের ভেতরটা আজও ধক্ করে ওঠে। সেই মেয়ের জন্যই সে বীজগণিত ছাড়ল। লেখাপড়া ছাড়ল। ওই নাইনে পড়াই হলো সার। দর্জাল মাগি এসে একদিন হেসে হেসে বলল– 'জানো, কাল আমার বিয়ে। বর দেখতে কী সুন্দর! তোমার চেয়ে কত্তো ভালো! তোমার নেমন্তন্ন, যেও।'
শালি আমার, তুই আমার সব খোয়ালি– গালি পাড়ে জগাই। তার পরদিন থেকে জগাইকে দেখা গেল না স্কুলে। সংসার ছাড়ল। ঘর ছাড়ল। গ্রাম ছাড়ল। মায়া-মোহ সব ছেড়ে গাঁজা ধরল। ক'দিন বাদে কৌপিন। তাই কিছুই মিলাতে পারছে না জগাই বীজগণিতের সূত্রে। বাতাসের তালে তালে কচি বাঁশের কঞ্চির মতো মনটা শুধু দোলে। যেন পদ্মদিঘির জল; পদ্মপাতায় করে টলমল।
এক একবার জগাইর ইচ্ছে করে পৃথিবীর সবাইকে বিশ্বাস করে? সবাইকেই ভালোবাসে? তখন সবই ভালো লাগে। মেয়েদেরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। মেয়েদের তখন মায়ের মতো মনে হয়। আবার মাঝে মাঝে যে কী হয়? তখন কাউকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। নিজেকেও না। মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ সে নিজে। ভেতরে ভেতরে প্রতি সেকেন্ডে সে পরিবর্তন অনুভব করে। এই যে সে সাধু, কত শিষ্য-শিষ্যা বাড়ি যায়, মন তো ভেতরে ভেতরে তিরিক করে? আসলে সে সাধু না। ভণ্ড। তবে বড় খাঁটি একটা জিনিস্ ঐ গাঁজা। আর প্রিয় বন্ধু কল্কে।
জগাই একটা গান বেঁধেছে। সব জায়গাতেই সে ওটা গেয়ে বেড়ায়–
ও মন মনরে, কান পেতে শোনরে
বসে ঘরের কোণরে, ডাকে তোরে বনরে
শন্ শন্ শন্‌রে, দেহে তোর রণরে
যাবি কখনরে, হয়ে পবনরে
পেতে চরণরে...
জগাই ভাবে– আশ্চর্য মিল তো? রবিঠাকুরও দিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও না। কোন্ শালা পেরেছে? হিটলারও পারে নি। লেনিনও না। গর্বে বুকটা তার পোটকা মাছের মতো ফুলে ওঠে। লোকদের ডেকে ডেকে শোনায়। দু'একটা ইঁচড়ে পাকা

ছোক্‌রা– যাদের এখনও গোঁফ গজায় নি, প্রশ্ন করে বসে– ও বাবা জগাইজি, (বাবাজি না বলে তারা জগাইজি বলে) এত ভালো লিখতে পারো তো আর লিখো না কেন?

প্রথম প্রথম মুস্কিলে পড়ে যেত জগাই। পরে ভেবে-চিন্তে ঠিক করে রেখেছে। এখন কেউ জিজ্ঞেস করলেই বিজ্ঞের মতো মিটমিট করে হাসে। বলে–

সে তোরা বুঝবি নে। যা অল্প তাই ভালো। বুদ্বুদ্ দেখেছিস্? কী সুন্দর! কতক্ষণ থাকে? ক্ষণস্থায়ী বলেই না সুন্দর! মে ফুল ক'বার ফোটে বছরে? একবার। নাইট কুইন? ষোল বছরে একবার। ভালো মানুষ ক'টা পৃথিবীতে? কম? এই যে আমার মতো সাধু? ক'জন আছে? বোঝ্ তাহলে, কেন লিখি না? কম জিনিসেরই কদর বেশি। দেখো না, মাতব্বরের কতগুলো পোলা-মাইয়া। মুরগির বাচ্চার মতো ছড়ানো থাকে উঠানে। খেয়ালও করে না কেউ। গুনেগুনে ঘরে ঢুকায় রাতে। আর ওপাড়ার ননী ঘোষের? এক ছেলে, এক মেয়ে? কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে জগাই ভাবে– মন্দ বলি নি তো? এত কথা জানলাম কী করে? নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান মনে হলো এ মুহূর্তে জগাইর।

জগাই কখনও স্নান করে না। স্নান করলে শরীরটা নোংরা থাকে না। আর নোংরা না থাকলে গোঁসাই গোঁসাই ভাবও হয় না। তান্ত্রিকদের যে স্নান করতে নেই। আর একটা মুস্কিল-স্নান করলে চুলের জটজট ভাবটা থাকে না। তাই বেশ আগেই ছেড়ে দিয়েছে স্নান করা। গা থেকে এখন একটা বেশ বোঁটকা বোঁটকা গন্ধ আসে। কেমন ভৈরব ভৈরব ভাব। তবে গন্ধটা তার সয়ে গেছে।

সেদিনের পড়ন্ত বিকেলের স্মৃতিটুকু মনের এক কোণে একটু বাসা বেঁধেছে জগাইর। সেই বাসার চড়ুই পাখির মতো ফুড়ুৎ করে ঝড়ুগোপালের বউ প্রবেশ করে। আবার ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যায়। যা হোক বউটা বেশ ডাগর। দেখতে যা! জড়ুগোপালের বাড়ি সে যায় নি কখনও। কিন্তু কয়েক পড়ন্ত বিকেল অপেক্ষা করেও যখন বউটাকে দেখা গেল না; জগাই তখন অছিলা খুঁজতে লাগল তাদের বাড়ি যাবার।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে।

মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল সাধনের। কেন যেন মনে হয়, সবাই সব সময় তাকে উপহাসই করে। সে যেন সার্বক্ষণিক পরিহাসের পাত্র। তোয়াক্কাই করে না কেউ। সে যে একজন মানুষ এবং মানুষের সন্তান ও পিতা; তা কেউ গ্রাহ্যই করে না বরাবর। তারপরও এত খারাপ তার লাগে নি কোনোদিন, আজ এখন যেমন লাগছে। নিজেকে খুব তুচ্ছ লাগছে। ছোট লাগছে। রাগে-ক্ষেভে; লজ্জায়-ঘৃণায়; দুঃখে-অপমানে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। পারে না। তাই আরও বেশি শান্ত হয়ে ইঁদুরটাকে দেখতে থাকে। কত বড় সাহস! তাকে গ্রাহ্যই করে না ইঁদুর। না হয় এক কেজিই হলো। তবুও তো সাধন পঞ্চাশ গুণ বড়। তা ছাড়া সে মানুষ। বুদ্ধি আছে। জ্ঞান আছে। কথা বলতে পারে। হাসতে পারে। কাঁদতে পারে। ইঁদুরের কি বুদ্ধি আছে? কথাটা ঠিক হলো না। বুদ্ধি না তাকলে এত চালাকি পারে কী ভাবে? বুদ্ধি আছে। তবে জ্ঞান নাই। কাণ্ডজ্ঞান। আত্মসম্মান বোধ নাই। মানুষকে মর্যাদা দিতে জানে না। নইলে এই জলজ্যান্ত মানুষটাকে সে উপহাস করতে পারত? কথায় বলে– সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। তাকে উপহাস করা? অতএব ইঁদুরের কাণ্ডজ্ঞান নাই। তাছাড়া সে হাসতে পারে না, কাঁদতেও পারে না। অন্তত সাধন দেখে নি। তাহলে অতটুকু জীবের এত দেমাগ কীসের? আশ্চর্য! সাধনের বাঁ হাতে ধরা হ্যারিকেনটা সে এসে শুঁকছে! অথচ ভয়ে তার পালোনো উচিত ছিল। তা নয়, উল্টো। সাধনের চোখে চোখ পড়তে লোমগুলো ফুলিয়ে, চোখ দু'টো গোল করে একবার ফোঁস করে উঠে আবার আপন কাজে মন দিল ইঁদুরটা। সাধন একবার ভাবল– লাঠি দিয়ে দেই শালার ভবলীলা সাঙ্গ করে। বড় মেয়েকে ডাক দিল– শিগগির একটা কাচি নিয়ে আয় তো তাপসী। তাপসী যদি বুঝতে পারত ইঁদুর মারার কথা, তাহলে যে কোনো একটা অস্ত্র এনে হাজির করত। কিন্তু ভাবল, কাস্তেই দরকার। খুঁজল অনেকক্ষণ। পেল না। তাই অন্য কিছুও দিল না। সাধনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল মুহূর্তগুলো। কোটি কোটি রাগ হলো। রাগের তাপে রাগ গলে জল হয়ে গেল। এত রাগ হয়েছিল যে রাগটাই মাটি হয়ে গেল। যেন রাগের তাপে রাগ পুড়ে ছাই। পরক্ষণেই সংযম হলো। দেখতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল– মারবে না ওটাকে। দেখাই যাক না কী করে ইঁদুর বাবাজি।

ধানের মাচানে বস্তা ভর্তি ধান। ইঁদুরে কেটে পয়মাল। সাধন তাই রাতে এলো দেখতে। হ্যারিকেনটা মাচানের উপর রাখতেই ইয়ে বড় এক ধাড়ি ইঁদুর গোঁৎগোঁৎ করতে করতে এসে শুঁকতে লাগল হ্যারিকেন। ঠিক একটা বাচ্চা শুয়োর। নাকি শুয়োরের বাচ্চা? যাই হোক, সাধন বুঝে নিল। ওটা তাকে পরিহাস করছে। মানুষই মানুষকে সমীহ করে না, আর তো ইঁদুর? ইঁদুরও আজকাল মানুষকে গ্রাহ্য করে না। অথবা একমাত্র সাধনকেই গ্রাহ্য করে না। কোনো বিড়ালও নেই সাধনের বাড়ি। ওষুধেও মরে না। বিষেও ভেজাল। ইঁদুরও চালাক। বিষ খায় না। বিংশ শতাব্দীর ইঁদুর তো? শিক্ষিত। তারা বোঝে– ওটা মারার চক্রান্ত। খবরের কাগজ পড়তে না পারুক, খেতে তো পারে? সে জ্ঞানেই সে মানুষের চালাকি বুঝতে পারে ।

কেন যেন সাধনের ভেতরটা আজ হুহু করতে লাগল। ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করে। খুব তুচ্ছ লাগে নিজেকে। স্কুলে শিক্ষকরা তোয়াক্কা করে না। ছাত্র-ছাত্রীরা মানুষ বলে গণ্য করে না। হোক সে দপ্তরি? তবু মানুষ তো! অভাবের সংসার। বউও পাত্তা দেয় না। ছেলেমেয়েগুলো হাসে। অবশ্যই উপহাস! সে কি বোঝে না এসব? এ তো গেল মানুষের কথা! আজ হাতে হাতে ফল পেল। ইঁদুরও পাত্তা দেয় না। কোনো জীব-জন্তুই না। পোকা-মাকড়ও না! এই সেদিন তাদের দোহা গাইটা তাকে তেড়ে এলো শিং বাঁকিয়ে। দোহনের সময় দিল পেছনের পায় দিয়ে এক লাথি। ফ্রি কিক্। মেয়ে গরুর লাথি। এ তো গেল গরু। ব্যাঙ? ব্যাঙেরইবা এত সাহস হবে কেন? তাও কুনোব্যাঙ। সোনাব্যাঙ হলে না হয় একটা কথা থাকত। দেখতে সুন্দর। চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কুনো? কী বিশ্রী দেখতে। তাও এসে রোজ কপালে বসে। ঘুমুতে হয় মাটির খাটালে। সেই সুযোগে ঘুমের ভেতর কপালে এসে বসে। যেন ঠাণ্ডা একখণ্ড বরফ। হাত দিতেই ঝপ্। লাফ দিয়ে পড়ে নেমে। মনে হয় সুইমিং পুল থেকে লাফ দিচ্ছে সাঁতারু। তাও শুধু যেত না। চিন্‌থ্ করে একটু হিসি দিয়ে যেত। তার মনে হচ্ছে– Life is nothing but fun. কথাটা বাঁধানো রয়েছে স্কুলের লাইব্রেরিতে। ইংরেজি স্যারকে জিজ্ঞেস করতে বলে দিয়েছিলেন অর্থটা। এ সবও উপহাস। ঘোর ইয়ার্কি। জীবনটাই কি একটা ইয়ার্কি?

একদিন তো ভয়ই পেয়েছিল। একটা একতারা বানিয়েছিল লাউয়ের খোল দিয়ে। ছিল ঐ মাচানের পর। মাঝে মাঝে সে গান করত ওটা বাজিয়ে। এক রাতে। নিঝ্‌ঝুম রাত। সবাই ঘুমে। ঘরে আলকাতরার মতো অন্ধকার। শুনতে পায় সাধন– বাজছে। একতারা বাজছে আপন মনে। একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটে বাজে। ভয় করছে। ভাবল– ঐশ্বরিক শক্তি। ভূতও হতে পারে? তবু বউকে জাগাতে সাহস পেল না। বউ আবার ভীতু ভাববে। সেটা গঞ্জনার। সাহসে ভর করে উঠল। টর্চ নিল। কাছে গেল। সুইচ চাপল। জ্বলল না। আশ্চর্য! দুরুদুরু করে উঠল বুক। সে জানত– ভূতের কাছে আলো জ্বলে না। ঘাম ছুটল। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। গুপীযন্ত্র গুপ গুপ করে। গুপী না সাধনের বুক– বুঝতে পারল না সাধন। চিৎকার দিয়ে উঠবে, এমন

সময় হঠাৎ খেয়াল হলো ব্যাটারিই ভরা হয় নি তাড়াতাড়িতে। ব্যাটারি ভরে আলো জ্বালতেই শব্দ স্থির। সপ্তর্পণে কাছে গেল আবার। আলো জ্বালল। দেখল– এক তারাটার খোলের ভেতর একা বসে একটি কুনোব্যাঙ। কীভাবে যেন পড়ে গেছে। আর বেরুতে পারে নি। তার বেরুনোর প্রচেষ্টাই বাজাচ্ছে একতারা। যা রাগ হয়েছিল ব্যাঙটার উপর? কিন্তু আজকের মতো এত খারাপ লাগে নি তার সেদিনও। পরপর সব ঘটনা তার মনে পড়ছে। কষ্ট হতে লাগল। শুধু মনে হয়– আর নয়। এ পৃথিবী তার জন্য নয়। সব পশু-পাখি, পোকা-মাকড়, ব্যাঙ আর ইঁদুরের জন্য। সবাই উপহাস করে তাকে। মানুষ বলে গণ্যই করে না কেউ। ইঁদুরটাকে না মেরে তাই চলে এলো। এসে শুয়ে পড়ল। চিন্তায় বিভোর হলো। সে কি এতই তুচ্ছ। ব্যাঙে তোয়াক্ক করে না। ইঁদুর গ্রাহ্য করে না। টিকটিকি, আরশোলা, উই, মাকড়সা কেউই না। কেঁচো পর্যন্ত না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেল। কেউ যদি তোয়াক্কাই না করল কীসের তবে বাঁচা? ছেঁড়া তেনাও মনে করে না কেউ। জীবনটা কি ছেঁড়া তেনার চেয়েও খারাপ? এত তুচ্ছ?

এমন কোনো আনন্দ আসে নি জীবনে
যাতে অশ্রু ঝরেছিল,
এমন দুঃখ এসেছে বহু
যাতে হেসেছি অনেক।

সেই থেকে সাধন দাসের মনটাই ভালো নেই। কোথায় যেন একটা বিদ্রূপের পাথর আটকে বসেছে বুকের ভেতর। নড়েও না। চড়েও না। বাতিকগ্রস্থ হয়ে উঠেছে মন। সকালে। স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। খাচ্ছে। সড়াৎ করে এক ইঁদুর দৌড়ে গেল থালের পাশ দিয়ে। আর খেলো না। উঠে গেল। জামাটা গায়ে ঢুকাতে যাবে, ঠিক সে সময়েই ফড়াৎ করে এক আরশোলা এসে পড়ল। মুখে। পুনঃ ফ্লাই ওভার করার মুহূর্তে আঠাল এক প্রকার তরল পদার্থ ঝেড়ে দিয়ে গেল। রুক্ষ মেজাজেই গেল স্কুলে। দেখল আগেই এসে গেছে ঝড়ুগোপাল। সেও দপ্তরি। খুবই ভাব দু'জনার মধ্যে। বাড়ির দূরত্বও বেশি নয়। একজনের ক্ষেতের আনাজটা, তরকারিটা অনায়াসেই অন্যের বাড়ি চলে যায়। ঝড়ুগোপালের খেতে হয়ত বড় একটা মিষ্টি কুমড়ো হলো– কেটে বউ তার একমাত্র সন্তান শ্যামলীর হাতে তাপসীর মাকে পাঠিয়ে দিল এক ফালি। সাধনের খেতে পেপে কিংবা শশা হলো– দু'টো ছিঁড়ে পাঠিয়ে দিল ঝড়ুগোপালের বাড়ি। দু'বউয়েও খুব মিল। দু'জনেই দু'জনকে দিদি ডাকে। কোনো বাড়ি পিঠে পায়েস হলে অন্য বাড়িরও ডাক পড়ে। প্রত্যেকের সাথেই প্রত্যেকের ভাব এ দুই সংসারের।

সাধনকে চিন্তিত দেখে ঝড়ুগোপাল কিছু হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতে সাধন বলল–

মচ্ছোব, ইঁদুরের মচ্ছোব। আর সহ্য হয় না। তাছাড়া তেলাপোকা, উইপোকা, ব্যাঙ এসব তো আছেই? ভাল্লাগে না আর। বাঁচা যাবে না এদের জ্বালাতনে। এত ইঁদুর, আর ইয়ে বড় বড়, যে ভয়ই করে না কাউকে। কী করি বলো তো? বিড়াল দিতে পারো একটা?

ঝড়ুগোপাল– ও, এই কথা? আমি ভাবলাম, আবার কী হলো কে জানে? তো একটা কেন, যত্তো লাগে আমি সাপ্লাই দেবো। নিশ্চিন্ত থাকো। কালই পাবে।

পরদিন একটু আগে আগেই স্কুলে এস্‌ছিল সাধন। একটু পরে হাসিমুখে ঝড়ুগোপাল এসে উপস্থিত– বিড়াল পাঠিয়ে দিয়েছি। কয়টা লাগবে? বাড়ি গিয়া দেখবা সব ইঁদুর শেষ। এবার নিশ্চিন্ত?

– ভালোই হলো। এবার দেখি বাছাধনরা যায় কোথায়?

– বিড়াল দেখে আবার চটে যেও না যেন?

– আরে না, না। একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে সাধন ইয়ে ধাড়ি একটা কালো বেড়াল দেখে খুব খুশি। ঘরে ঢুকে দেখে আরও একটা বড় বিড়াল। এটার রঙ আকাশি। আকাশি রঙটা তার খুব পছন্দ। খুব ভালো লাগল। মনে হয় আকশটাই মাটি দিয়ে হাঁটছে। সাধনেরও আকাশি রঙের বিড়াল হতে ইচ্ছে করল। হলে কী মজা হতো? যাক দু'টো এনে ভালোই হয়েছে। একটার নাম রাত্রি। আর একটার নাম আকাশ।

একটু পরে সাদা একটা বের হলো। ভাবল– তিনটেই এনেছে তাহলে? তা আনুক। শালার ইঁদুর তো সাবাড় হবে? বড় মেয়ে তাপসী এসে বলছে– দ্যাখো বাবা, কাকা কতগুলো বিড়াল দিয়া গ্যাছে।

সাধন– ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে।

কিন্তু সেই কতগুলো যে মাত্র তিনটে নয়, সাধন তা তখনও বুঝতে পারে নি। হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে সাধন। আর অমনি বিড়ালগুলো এসে ঘুরঘুর করতে লাগল থালের চারপাশ। সাধনের চক্ষু চড়কগাছ। মাথা ঘুরে গেল। এ যে কোটি কোটি বিড়াল? লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, সাদা, কালো, হলুদ, কমলা, আকাশি, বাতাসি নানা রঙের বিড়াল। গোটা দশ-বারো তো হবেই? রাগ হলো সাধনের–

এ কী কাণ্ড-কারখানা? ঝড়ুগোপালও তাকে উপহাস করে? প্রাণের বন্ধু? কেউই কারও বন্ধু নয়? ফাঁক পেলে সব শালাই বাঁশ দেয়? প্রমাণসাইজ একটা বিড়াল হলেই চলত? তা নয়, বিভিন্ন প্যাটার্নের গোটা দশ-বারো। তাও রঙ করে? এটা কি বিড়ালখানা? এদের যন্ত্রণায়ই তো অস্থির থাকতে হবে? ইঁদুর তাড়াতে বিড়াল? এখন বিড়াল তাড়ানোর কী হবে? কুকুর? আনবো শালর কুকুর। আবার ভাবে– আগে ইঁদুরগুলো তো সাফ হোক। তারপর এক একটাকে ধরে দেবে বিদায় করে।

বউ সুরেশ্বরী থালে তরকারি দিলে সাধন খাওয়া শুরু করল। কইমাছের মুড়োটা রেখেছে থালের এক পাশে। সাথে সাথে কয়েক জোড়া চোখ মুড়োটার দিকে একবার ফ্লাশ ব্যাক মেরে সাধনের হাতে ধরা গ্রাস অনুসরণ করে উঠে গেল মুখের কাছে। সাধনের হাত নেমে আসার সাথে সাথে বিড়ালদের দৃষ্টিও নেমে আসে থালের পরে। বিচ্ছিন্ন ভাতগুলো ক্রমশঃ সাধনের হাতে গ্রাস হতে থাকে। বিড়ালগুলোর দৃষ্টিও মিলিত হয় এক বিন্দুতে। এভাবে থাল থেকে সাধনের মুখ পর্যন্ত বারবার ওঠানামা করে বিড়ালদের দৃষ্টি। মনে হয়, চারদিকে ভিড় করে একদল বুভুক্ষু খাওয়া দেখছে। সাধনযে দু'একটা তাড়া দেয় নি, এমন নয়। কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করে নি কেউ। নড়ার আগ্রহও দেখাল না। ভাবখানা যেন– তুমি কে হে তাড়া দেবার? স্বৈরাচারের মতো একাই খাচ্ছে সাধন। এক মুঠোও দিচ্ছে না। অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল তাদের। হঠাৎ মুড়োটা লক্ষ্য করে থাবা মারল একটা বিড়াল। আর স্কাড

ক্ষেপণাস্ত্রের মতো মুহূর্তে থালে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যগুলো। বেঁধে গেল যুদ্ধ। পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। থালের ভাত ছিটছে খইয়ের মতো। কারণ, থালে বিড়াল লাফাচ্ছে। খাওয়াটাই পণ্ড। মেজাজটাই বিগড়ে গেল সাধনের। কী করবে ভেবে পেল না। কান্না পাচ্ছিল খুব। বউ সুরেশ্বরী হাসি চাপতে না পেরে মুখে আঁচল চেপে কাঁপছে মৃগীরুগীর মতো। তা দেখে গ্যাস্ট্রিকের রুগীর মতো জ্বলে যেতে লাগল সাধনের ভেতরটা। উঠে চলে এলো।

অঘ্রান মাস। মাঠের জল শুকায় নি তখনও। শীতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কেমন এক নবান্ন নবান্ন ভাব প্রকৃতিতে। পথঘাট কাদা-কাদা। বিড়ালগুলোও তাই পার হতে পারে নি কোথাও। ওদিকে কোথা থেকে যেন এক গর্ভবতী কুকুরী এসে জুটেছে। আর হ্যাংলার মতো পেছনে ঘুরছে তাদের কুকুরটা। মনটাই বিষিয়ে উঠেছে তার যন্ত্রণায়। কুকুর, বেড়াল আর ইঁদুরের মেলা। এ যেন প্রাণি-জাদুঘর! চিড়িয়াখানা! প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু এরা। অথচ কী মিল, কী ভাব একের সাথে অন্যের? এ যে ভাই কলিকাল, সাপে চাটে ব্যাঙের গাল। বিড়ালগুলো ইঁদুরগুলোকে শেষ করার পর যদি কুকুরগুলো বিড়ালগুলোকে তাড়িয়ে দিত, খুব ভালো হতো। কিন্তু বন্ধুত্ব দেখে সাধন অবাক হয়ে যায়। এ যেন কেষ্ট-পিরিত। একই সাথে ঘুরছে ফিরছে বিড়াল আর কুকুর। আদর করছে। কুকুরে চাটে বিড়ালের গা। খায় একই সাথে। ঝগড়া নেই কোনো। ইঁদুর আর বিড়ালেও বেশ ভাব। শুয়ে আছে বিড়াল। তার পাশে নির্ভয়ে বেড়াচ্ছে ইঁদুর। চোখ পিট পিট করে একটু তাকাচ্ছে বিড়ালটা। আবার বন্ধ করছে। পাশেই কুকুর। এসবই সাধনের চোখের সামনে। এদের ভাব দেখে জ্বলে ওঠে রাগে। ভাবে– শালা মানুষে মানুষে যদি এত মিল থাকত, তবে জগতে আর এত অশান্তি থাকত না। যত মারামারি- খুনোখুনি সব মানুষের মধ্যে। পশুরাই ভালো।

কিন্তু মানুষ যা চায়, তার উল্টোটাই ঘটে জগতে বেশি। সাধনই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সাধন যেন হিউমান গিনিপিগ। জীবনের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা সুঁচের মতো ফুটে থাকে সবসময়। জীবনটা কি এরকমই? স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা। কাজের চাপটা একটু বেশি বর্তমানে। অফিসে এসে ঝড়ুগোপালকে দেখতে পেল না। শুনল, অসুস্থ সে। বাতে পড়েছে। ছুটির পরে তাই বাড়ি না গিয়ে সরাসরি ঝড়ুগোপালের বাড়ি গিয়ে হাজির। ডাক্তারও এসেছে। তিনি বলছেন– প্যারালাইসিসের লক্ষণ। ওষুধ দিয়ে গেলেন। কিন্তু দিনদিন অবনতির দিকে যাচ্ছে ঝড়ুগোপালের অবস্থা। দিন-দুই বাদে শরীরের ডান দিকের অর্ধেকটা অবশ হয়ে গেল। প্যারালাইসিস। ডান হাত, ডান পাসহ মুখের অর্ধেকটা অবশ। কথা বলতে পারছে না। নড়তে পারছে না। লালা ঝরছে মুখে। মুখে কেমন এক প্রকার শব্দ হচ্ছে। স্কুল ছুটি হলে সাধন আবার এলো। ভালো হয়ে যাবার আশ্বাস দিল। কিন্তু সাধন জানত, এ রোগ সাধারণত ভালো হয় না। মনে মনে রোগের উপর রেগে গেল সাধন। কিন্তু মানুষের রাগে রোগের কী-ই বা যায় এসে?

ঝড়ুর স্ত্রী বিন্দু খুব সুন্দরী। মেয়ে শ্যামলীও বেশ ডাগর। একমাত্র সন্তান শ্যামলী এবার নাইনে। বছর দেড়েক পরে মেট্রিক দেবে। মেয়েকে বেশ লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে। ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। বাবার অসুখের কারণে পড়তে পারে নি তেমন। তবে শিক্ষকরা সান্ত্বনা দিচ্ছে। সাধন খোঁজ-খবর নিচ্ছে, সবসময়। শীতটা বাড়ার সাথে সাথে অসুখ বাড়ছে। শীতটাও একটু বেশি এবার। ঝড়ুর অবস্থা বর্তমানে বেশ খারাপ।

শীতের ছুটি।

ছুটির শেষে শুরু হলো নতুন বছর। ১৯৭১ সাল। জানুয়ারি মাস। দুই তারিখ। স্কুল খুলেছে। শ্যামলী পাস করেছে। এবার ক্লাসে টেনে। কিন্তু বাবার চাকরি চলে গেল। এমনিতেই অভাবের সংসার। তারপর চিকিৎসা খরচ। তাও চাকরি গেল চলে। সংসারই চলে না তো পড়ালেখা? তবুও সাধনের উৎসাহ ও সাহায্য সহানুভূতিতে চালিয়ে যেতে লাগল। কর্তৃপক্ষ শ্যামলীর সমস্ত বেতন মওকুফ করে দিল।

আকাশভরা তারার মাঝে

আমার তারা কই?

পাশের গ্রামের তপনের সাথে শ্যামলীর যেন কেমন সম্পর্ক। ঠিক তাকে ভালোবাসাও বলা যায় না। চিঠি-পত্রও আদান-প্রদান হয় নি কখনও। তবে কথা হয়েছে দু'চারটে। দু'জনেরই মনে প্রছন্ন একটা ভালোবাসার বীজ আছে। টের পাওয়া যায়। তবে অঙ্কুরিত হয় নি। কখনও মুখোমুখি হলে দু'জনে, দু'জনেরই শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়। লজ্জা এসে ভর করে চোখের পাতায়। কেমন একটা ধরা পড়ে গেছি গোছের সংকোচ। চিঠিও লিখেছে দু'জন দু'জনকে। দিতে পারে নি। সময় এবং সাহসের অভাবে নিজের লেখা চিঠি নিজেরাই বারবার পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলেছে যাতে কেউ না দেখতে পায়। এ রকমেরই এক ছেঁড়া-খোঁড়া চিঠির অংশবিশেষ জোড়াতালি দিয়ে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছিল শ্যামলীর বান্ধবীরা, অবশ্য তাতে কারওই নাম ছিল না। ইতিও ছিল না। ছিল শুধু– ইতি তোমার...। হাতের লেখা অবশ্য তারা বুঝতে পেরেছিল। আর এ কারণেই চেপে ধরেছিল শ্যামলীকে। প্রথমে অবশ্য অস্বীকার করেছিল শ্যামলী। পরে আম্‌তা আম্‌তা করে কোনোভাবে ধামাচাপা দিল প্রসঙ্গটা। কিন্তু ছাইচাপা আগুনের মতো বিষয়টা মনে রঙ ধরালো তার।

ব্রাহ্মণের ছেলে তপন। তথাকথিত ব্রাহ্মণবংশীয় আভিজাত্য তার ভেতর একদম নেই বললে ভুল হবে। আছে। তবে ক্ষীণ। কালে নদী যেমন তার স্রোত হারায়। পড়ে থাকে বালুর রেখা। তেমনি ব্রাহ্মণদের আভিজাত্যও এখন রেখায় পরিণত হয়েছে। ভরা বর্ষার শেষ। শ্যামলী শূদ্র বলে তেমন কোনো ঘৃণা নেই তপনের। তবে প্রথম দিকে মন যে একটু খুঁৎখুঁৎ করে নি এমন নয়। রূপের মোহে উড়ে গেছে। ভালোবাসা তো জাত-পাত মেনে হয় না। এ হলো এক প্রকার আসক্তি। গায়ের রঙে চোখে রঙ লাগে। তারপর মনে রঙ ধরে। আর সে রঙ স্মৃতির ক্যানভাসে আঁকে ভালোবাসার অক্ষয় ছবি। মেঘের কি কোনো রঙ থাকে? তবে সূর্য যখন দিনের শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে মেঘের ঠোঁটে শুতে যায় রাতের বিছানায়, তখন কেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মেঘ? আসলে রঙ ভেতরেই থাকে। শুধু রাঙাবার অপেক্ষা। সে যে-ই রাঙাক। তখন আর জাত-পাতের বালাই থাকে না। নাবিকের যেমন একমাত্র লক্ষ্য থাকে পোতাশ্রয়, তেমনি প্রেমিকেরও একমাত্র লক্ষ্য থাকে প্রেমিকা। তাছাড়া জাত কি গায়ে লেখা থাকে? তবে তপনের মা-বাবা অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে একটু গোঁড়া। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাড়ি জলও স্পর্শ করে না। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তপন অবশ্য সহজ! শহরে থাকে। ফরিদপুর। ইয়াসিন কলেজে পড়ে। বি.এ.। ছুটিছাটায় বাড়ি আসে। লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করে শ্যামলীর সাথে। ঝড়ুগোপাল রোগে পড়ার পর দেখার ছুঁতো করে মাঝে মাঝে তপন যায় ওদের বাড়ি। অসুখের উপর মনে মনে একটু সন্তুষ্টই হয় তপন। না হলে মুস্কিল হতো। খোলামেলা কথাও বলে এবার। টুকিটাকি জিনিসপত্র কিংবা দু'একটা বই-খাতাও গোপনে কিনে দেয় শ্যামলীকে। প্রথম প্রথম একটু আধটু আপত্তি জানিয়েছিল শ্যামলী। ধোপে টেকে নি। এখন আর নিতে লজ্জাও লাগে না, আপত্তিও জানায় না। মনে হয়– এ যেন তার পাওনা জিনিস। প্রথমদিকে দু'একটা জরুরি কথা লিখে চিরকুট দেয়া শুরু হয়। পরে কাগজ ও লেখার আকার বৃদ্ধি পায় এবং চিঠির সম্বোধন ক্রমশঃ গাঢ় এবং ক্রমে আরও গভীর হয়ে পড়ে। ভালোবাসার অঙ্কুরিত বীজপত্র এবার মনের অন্দর ফেলে পাখা মেলে উড়তে চায় আলোর আকাশে। আর তাই এককান, দু'কান হতে হতে কথাটা জানাজানিও হয়ে যায় এক সময়।

এদিকে বিন্দুর অবস্থাও শোচনীয়। চিকিৎসার খরচ চালিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। স্বামীর অবস্থারও অবনতি হচ্ছে দিনদিন। পায়খানা-প্রস্রাব-কফ-থুতু এখন বিছানাতেই। মাঝে মাঝে বিন্দুর ঘৃণা হয় প্রচণ্ড। স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। মনে হয় এর চেয়ে মারা যাওয়াই ভালো। কী করবে সে একজন অথর্বকে নিয়ে? আবার ভাবে, বেচারার দোষ কী? অসুখের উপর তো কারও হাত নেই? হাজার হোক স্বামী তো? নানান দুশ্চিন্তায় জর্জরিত বিন্দু। দুশ্চিন্তায় শরীরও গেছে রোগা হয়ে। অভাবের ছাপ পড়েছে তার চোখে মুখে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।।

ঝড়ুগোপালের অসুখ হবার পর নানা লোক আসছে যাচ্ছে। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। সাধু বাবাজি জগাইও মাঝেসাঝে আসছে এ সুযোগে। ভালো-মন্দ উপদেশ দেয়। জলপরা, পানিপরা দেয়। ঝাড়-ফুঁক করে। এ সুবাদে বিন্দু ও শ্যামলীর সাথে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশতে পারে। তবে গোপনে গোপনে একটু-আধটু দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে তার। এই যেমন জলপরা দেবার জন্য শ্যামলীকে হয়ত জল আনতে বলল। জল ঢালছে শ্যামলী কলসি থেকে। শ্যামলীর পাছার বেড়টা একটু দেখে নিল জগাই। আনমনে জল ঢালছে শ্যামলী। হাঁটুর চাপে হয়ত কামিজ ছাপিয়ে বুক ফুলে উঠেছে উপরের দিকে। সেই ফাঁকে জগাইর দৃষ্টি ঘুরে এলো শ্যামলীর বুকের উপত্যকায়। অথবা উপুড় হয়ে বিন্দু কিছু তুলছে। বুকের কাপড়টা একটু ঝুলে গেছে। আর সেই ফাঁকে জগাইর দৃষ্টি বগলের পাশ দিয়ে একবার ঘুরে এলো বুকের ঈষৎ সাদা অংশে।

এই একটু আধটু দৃষ্টিবিভ্রমকে জগাই দোষই মনে করে না। ভাবে– সে তো আর তার দৃষ্টি দিয়ে আবরণ সরিয়ে দেখছে না। আলো থাকলে যেমন চোখে এসে পড়ে, এও তেমনি। এতে তার দোষ কী? বরং সুন্দরকে না দেখা বোকামি। গাছে ফুল ফুটলে কে না দেখে? কুঁড়ি না ফুটলে তো কেউ দেখতে পারে না ভেতরে কী আছে? তবে বুঝতে পারে। তা বুঝুক। বোঝায় তো আর দোষ নাই? তবে কোনো কুঁড়িকে জোর করে তার উপরের সবুজ বৃত্তটাকে ছিঁড়ে দেখতে যাওয়াটা অন্যায়। বরং প্রস্ফুটিত পাপড়িতে দৃষ্টি পড়বে, তাতে আর দোষের কী? এ সব তো আলোরই খেলা। ইত্যাদি নানা যুক্তির অবতারণা করে জগাই নিজের মতের স্বপক্ষে একটা মন্তব্য দাঁড় করিয়ে নেয়। তাই এই লুকিয়ে চুরিয়ে তাকানোতে তেমন একটা দোষ খুঁজে পায় না সে। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় জগাইর– ধরা পড়ে গেছি নিজের কাছে। ওই সেই গল্পের মতো। এক চোরা বাপ তার ছেলেকে নিয়ে গেছে চুরি করতে। ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলেছে– দেখিস, কেউ দেখে ফেললে বলিস। কিছুক্ষণ বাদে ছেলেটি বলছে– বাবা, একজন দেখে। বাপ দ্রুত বের হয়ে আসে। কাউকে দেখে না। বলে– কই, কে দেখে? কেউ তো নাই এখানে? ছেলে বলে– একজন দেখে বাবা! ভগবান।

বাপ– দূর বোকা, বলে চলে গেল আবার চুরি করতে। কিন্তু পারল না। কেবলই মনে হতে লাগল– ভগবান দেখে। ভাবল– ভগবান থাকুক বা না থাকুক, তার ছেলে তো দেখে? আরও ভাবল– ছেলে দেখুক না দেখুক, সে নিজে তো দেখে? তাই আর তার চুরি করা হলো না। জগাইরও সে অবস্থা। কখনও সখনও ভাবে– যদি দোষেরই হবে না, তবে সরাসরি তাকালেই পারো, লুকিয়ে চুরিয়ে তাকাও কেন? মাঝে মাঝে তাই সরাসরিই তাকায়। আর তখন সে লজ্জায়ও পড়ে। কারণ, সরাসরি তাকানোর ফলে হয়ত জগাইর তাকানো দেখে কেউ দ্রুত বুকের আঁচলটা টেনে দিতে দিতে জগাইর দিকে তাকায়, জগাই তখন লজ্জা পেয়ে যায়। তখন তার ধরা পড়ে গেছি মনে হয় এবং চোখে একটা উদাসীন ভাবে টেনে এমন ভাবে তাকায় যেন কিছুই দেখে নি সে। সামনে তার আকাশ, বাতাস, মেঘ। যা না দেখলেও চলে। অথবা দেখাই যায় না। অথবা চোখের সামনে সবই আছে, তাকাচ্ছে কিন্তু দেখছে না, দেখছে অন্য কোনো তৃতীয় বস্তু, যা সেখানে নেই।

এভাবেই পাপ-পুণ্যের একটা সীমারেখা টেনে নেয় জগাই। প্লাবনের জল যেমন স্থলকে ঢেলে দিয়ে ক্রমশঃ তার বিস্তৃতি বাড়ায়; তেমনি জগাইর মনের পাপ অংশটুকুও ক্রমশঃ পুণ্যকে আচ্ছন্ন করে পাপের পরিধিটাকে বিস্তৃত করে। আকাশের একখণ্ড ঘনকালো মেঘ যেমন বাড়তে বাড়তে গোটা আকাশটা ছেয়ে ফেলে; ঢেকে ফেলে সূর্যের আলো; নেমে আসে অন্ধকার, জগাইর মনেরও একখণ্ড কালো পাপ ক্রমশঃ গাঢ় ও বিস্তৃত হতে হতে ঢেকে ফেলে পুণ্যের ঔজ্জ্বল্য। জগাই এখন নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিত্যাগ কর। জগাইর মন এখন নদীর জল। জোয়ার-ভাঁটা খেলে। এই ফুলেফেঁপে প্লাবণ। এই ক্ষীণকটি ক্ষণস্রোতা। নিজেই মনের নাগাল পায় না। তবে জোয়রের ভাগটাই প্রবল। ভাঁটা থাকলেও তো জল শুকিয়ে যায় না একদম? তাই তার ভাবনা প্রায়ই– ঝড়ুগোপালের বউকে কী করে বাগে পাওয়া যায়। আবার ভাবে– মেয়েটাও তো খাসা। বেশ জুতসই চেহারা। কেমন ডাগর পুঁইলতার মতো। পরক্ষণেই ভাবে– মেয়েটাকে নিয়ে কিছু ভাবা ঠিক হবে না। সেটা অন্যায়। ভারি অন্যায়। কিন্তু তার মাকে নিয়ে ভাবা যায়। কারণ, সে তো মহিলা। নারী। আর তাছাড়া স্বামী বাবাজি অক্ষম। বিন্দুরও তো একটা জীবন– না কি? স্বামী থাকতেও বিধবা– তো তাকে নিয়ে ভাবায় দোষের কী? বরং না ভাবাই দোষের। কারণ নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা মানুষের কর্তব্য। অসহায়কে উপকার করা মানুষের ধর্ম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই তো বিধবাবিবাহ প্রচলন করে গেছেন। এ ও তো সে রকমই।

ভাবতে ভাবতে একদিন চট্ করে এক বুদ্ধি খেলে যায় তার মনে। সে তো একলাই থাকে আশ্রমে। বিন্দুকে ফুলিয়ে ফাসলিয়ে আনলেই তো চলে কোনো এক রাতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে– সামনে অখণ্ড তমসাঘেরা এক মায়বী রাত। থেকে থেকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি ফুটছে ঝোপে ঝোপে। গুঁড়িগুঁড়ি আলো যেন অন্ধকারকে আরও তীব্র করে তুলছে। আর দু'হাতে সে অন্ধকার ফাঁক করে শিশিরের শব্দের মতো পায়ে হেঁটে বিন্দু এসে দাঁড়ায় তার সামনে। দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই বোঝে– কাজটা খুব কঠিন। বিন্দু রাজি হবে না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর চমৎকার একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

যেমন ভাবা, তেমনি করা। নিরালায় ডেকে নিয়ে বিন্দুকে অনেক ভূমিকা করে জগাই একদিন তুলল কথাটা।

বলল– স্বামীকে তোমার ভালো করে দিতে পারি। একটা ওষুধ আছে। স্বপ্নে পাওয়া, তবে বহুৎ হাঙ্গামা তাতে। একটা যজ্ঞ করতে হবে। 'চণ্ডিকাভস্ম তন্ত্র-সাধনা যজ্ঞ'। (মনে মনে হিসেব করে দেখল জগাই এ মাসেই এক মঙ্গলবারে অমাবস্যা পড়েছে।) এ বড় কঠিন যজ্ঞ। করতে হয় একমাত্র অমাবস্যা শনিবার অথবা মঙ্গলবারে। এই দিন মা কালীর দিন। যজ্ঞশেষে মন্ত্রপূত ভস্মসুধা গায়ে মাখতে হবে নিজের এবং বাকি ভস্মসুধা নিয়ে রোজ রাতে মাখতে হবে স্বামীর গায়ে। তাহলে শ্রীঘ্রই ফল লাভ হবে। আশ্চর্য ফল হলো কথাটায়। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। বিন্দু ভাবল– সাধু বাবাজি যখন বলছে, তখন দেখিই না ভস্মসুধা এনে। এ মাসেই তো অমাবস্যা পড়েছে মঙ্গলবারে, রাতে আশ্রমে গিয়া নিয়া আসবো। কী এমন কঠিন কাজ? তাই সহজেই রাজি হয়ে গেল বিন্দু। এক ভুল থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষ আর এক ভুল করে বসে। এক মিথ্যেকে ঢাকার জন্য শত মিথ্যের আবরণ সৃষ্টি করে। এক পাপ গোপন করে নতুন আর এক পাপ দিয়ে। মানুষ বোঝে না– পাপ একদিন প্রকাশ পাবেই। পাপের বস্তু দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় সম্ভব না। পাপের পথেই চলছে বিন্দু আর জগাই। একজন না বুঝে, বিশ্বাসে; অন্যজন বুঝে, অবিশ্বাসে। শর্ত আরোপ করল জগাই– ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানানো যাবে না কথাটা। তাহলে ফল হবে না ভস্মসুধায়। গভীর রাতে যেতে হবে। এক বস্ত্রে। তা-ও সেলাইবিহীন। রাতরঙা শাড়ি। খালি পায়ে। নিরাভরণ। কোনো অলঙ্কার থাকতে পারবে না গায়ে। শাঁখা, চুড়ি, দুল নিষিদ্ধ। মনে রাখতে হবে– চণ্ডিকাভস্মতন্ত্র-সাধনা। মা কালীর সাধনা। বড় কঠিন।

সাধুদের প্রতি কোনোদিনই তেমন বিশ্বাস বা ভক্তি ছিল না বিন্দুর। জগাইর সাথে মিশতে মিশতে এবং তার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে শুনতে ইদানিং কেমন একটা ভক্তি ভক্তি ভাব এসে গেছে মনে। জগাইর এই বিধিনিষেধ শুনে ভক্তিটা যেন আরও একটু বেড়ে গেল। তাই সে মোক্ষম দিনটির প্রতীক্ষায় কাল কাটাচ্ছে বিন্দু আর জগাই, দু'জন। একজন স্বামীর মঙ্গলের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। অন্যজন নিজের জৈবিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে পাপ পুঁজি করার প্রকল্পে।

চিনবি যদি চিনিস তবে চিন্তামণির আবাসখানি,
শুনবি যদি শুনিস্ তবে শ্রবণভ'রে অভয় বাণী।

অবশেষে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। অমাবস্যা, মঙ্গলবার। তিমিরঘন রাত। জগাইর ভাষায় মাতৃগর্ভের মতো অন্ধকার। এত গাঢ় অন্ধকার যেন চাকু দিয়ে কাটা যায়। আকাশে মেঘ মুখ গোমড়া করে আছে, একটুও হাসে না। মেঘের ঠোঁট থেকে বিদ্যুৎও নিয়েছে বিদায়। আকাশের বাগানে ফোঠে নি তাই তারার কোনো ফুল। এমন দিনে হয়ত রাধা একাই যেত শুধু অভিসারে। আর কোনো নারীর কি এত সাহস আছে?

সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে কচি একটা ডাব জলঘটে সাজিয়ে রেখে সামনে গভীর অমানিশা রাতে ধ্যানে বসেছে জগাই। ধ্যানে? কার ধ্যানে? শিব না পার্বতীর? নাকি বিন্দুর? বিন্দুর আগমন প্রতীক্ষায়? উত্তর দিকে হিমালয়। হিমালয়ে মহাদেব, কালী থাকে। তাই উত্তরের দিকে মুখ করে সামনে জলঘট সাজিয়ে উলঙ্গ বসে আছে জগাই। এ সাধনায় কোনো বস্ত্র রাখতে নেই গায়ে। ডানে সিঁদুরমাখানো লোহার ত্রিশূল। বায়ে ক্ষীণশিখা রেড়ির তেলের বাতি। তাতে দু'হাত দূরের জিনিস যায় না দেখা। সে আলোয় অন্ধকার যেন আরও বেশি গাঢ় হয়ে আছে। পাশে ত্রিশূলের কাছে গাঁজার কল্কে। কল্কের পর কল্কে গাঁজা টেনে সাবাড় করেছে জগাই। আর তারই ভস্ম ঢেলে রাখছে কলার পাতায়। সময় মেটেই কাটে না। প্রতীক্ষার সময় যেন চুইংগামের বিস্বাদী অবশিষ্ট। ফুরোয় না। মনে মনে ক্ষেপে যায় জগাই। ভাবে– হয়ত আসবে না। তবুও অপেক্ষা করে কান খাড়া করে। চেষ্টা করে শুনতে কাঙ্ক্ষিত কোনো পদশব্দ বা সঙ্কেত, পায় না।

আজ একটু বেশি বেতালা করছে ঝড়ুগোপাল। ঘুমুচ্ছে না। তাকে সামাল দিতে দিতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বিন্দু। মেয়েটাও অনেক্ষণ জেগেছিল। এইমাত্র ঘুমিয়েছে সে। মড়ার মতো পড়ে থাকে ঝড়ুগোপাল। বিন্দু ভাবে– এই বুঝি ঘুমিয়েছে। রওনা দেবে ভাবে, তখনই বুকের ভেতর ঢিব্‌ঢিব্ করতে থাকে। যখনই উঠি উঠি করে, তখনই একটা কিছু ফরমায়েশ করে বসে ঝড়ু। এই করে করে দেরি হয়ে গেল বেশ। এক সময় মনে হলো সত্যিই ঘুমিয়েছে ঝড়ু। তাই খুব সাবধানে দরোজার ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে বিন্দু। চারদিক দেখে নিয়ে খুব সাবধানে, সন্তর্পণে পা ফেলে চলে সে সাধুবাবার আশ্রমের দিকে। মনে ভয় আর আনন্দ। ভয়– কেউ দেখে ফেলে যদি। আনন্দ– তার স্বামী ভালো হয়ে উঠবে। আবার ফিরে পাবে চাকরি। আবার সব হবে। সব।

প্রতীক্ষা করতে করতে অতীষ্ট হয়ে ওঠে জগাই। ভাবে– মাগি বুঝি তার মতলবটা টের পেয়ে গেছে। ধুৎ ছাতা, গোসাই গোসাই ভাবটাই বেত্তা। এতক্ষণ তার এ বসে থাকাটাই মাটি। মেয়েমানুষের কথার দাম নাই। এমন সময় বাইরে পূর্ব পরিকল্পিত কাঙ্ক্ষিত সেই সঙ্কেত। পরপর তিনটি টোকা। টিকটিকির মতো টক্ টক্ টক্ করে ওঠে দরোজার পাল্লায়। সর্তক হয়ে ওঠে জগাই। দ্রুত ঢিব্ ঢিব্ করা শুরু হয় বুক। জগাই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে হয় স্বপ্ন। অথবা কল্পনা। ভেতরে বসেই আস্তে করে বলে–

বসন আনা চলবে না। বিবস্ত্র হয়ে করতে হয় এ সাধনা। নারীর বসন এ ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায় সাধনায়। এক নিশ্বাসে বসন খুলে রেখে পুকুরে নেমে এক নিশ্বাসে তিনটি ডুব দিয়ে গা না মুছে চলে আসবে।

বিন্দু বাবাজির আদেশ পালন করল। এবারে তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিল জগাই। বলল–

মনে মনে মা চণ্ডীর নাম জপ করতে থাকো। কারণ, এটা হলো চণ্ডীকাভস্মতন্ত্র-সাধনা। তুমিই এখন চণ্ডী। মন্ত্রপূত ভস্ম গায়ে মাখতে হবে। তার আগে কালীর মতো জিভ বের করে ডাবের উপর ডান পা রেখে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে। এরপর যজ্ঞ শুরু।

এই বলে জগাই ঝপ্ করে চোখ বন্ধ করল। জগাই ভাবছে চোখের সামনে এখন যে দৃশ্য সে দেখবে তা কোনোদিন, কখনও সে দেখে নি। কীভাবে দেখবে, তা বুঝতে না পেরে চোখ বুঁজে ফেলল। আর অমনি ঘরে প্রবেশ করল বিন্দু। জগাই যেভাবে যা বলেছিল বিন্দু সে ভাবেই তাই করল। ভেতরে ভেতরে কেমন এক অস্বস্তি বোধ করছে জগাই। ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে বিন্দু। ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের জলে লতায়-পাতায় জড়ানো সাপ যেমন সপাৎ সপাৎ শব্দে পড়ে ঠিক তেমনি এক শব্দ। ভয়ভয় করে জগাইর। গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। এগিয়ে আসছে বিন্দু। যেন বিষাক্ত সাপ। সারা গায়ে আবরণ নেই কোনো। গা থেকে টপ্‌টপ্ ঝরে পড়ছে জল। যেন সাপের জিভ থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা বিষ। যদিও চোখ তার বন্ধ, তবুও মনে হয় দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। একবার ভাবে– চোখ খুলে দেখে একটু। পারে না। সাহসে কুলায় না। মনে হয়ে সামনে ফণাময়ী কালসাপ। চোখ মেললেই মেরে দেবে বিষাক্ত ছোবল। আবার মনে হয়– ভেতর থেকে চোখ দু'টো কে যেন টেনে ধরে রেখেছে। সে চেষ্টা করছে। অথচ খুলতে পারছে না চোখের পাতা। ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে তার বুক। দেখতে পাচ্ছে সে– সামনে এক জ্বলজ্যান্ত উলঙ্গ নারী দাঁড়িয়ে আছে মা কালীর ভঙ্গিমায়। হঠাৎ সেই সেদিনের বিকেলের দৃশ্য ভেসে উঠল মনে। বিন্দু গা ডলছে উদোম বুকে। পুকুরে। কত দূরে ছিল তা সেদিন। আজ তা হাতের মুঠোয়। একান্ত তার। কত নিভৃতে, কত একান্তে, গোপনে।

জগাইর নির্দেশমতো মা কালীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু। সামনে উলঙ্গ জগাই বসা। পদ্মাসনে। বুক ভর্তি দম। চোখ বন্ধ। ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে বিন্দুর মন। এত ভণ্ড জগাই? আগে তো বলে নি এ কথা? তাহলে কখনওই আসত না সে। অথচ কী মধুর মধুর উপদেশ? কত ভালো কথা! মানুষের ভেতর বাইরে কী আশ্চর্য অমিল!? বাইরে সৎ মানুষ, ভেতরে কতটা অসৎ হতে পারে? মানুষের বাইরেটা কত সুন্দর! অথচ ভেতরটা কত অসুন্দর! কত কুৎসিত! কত বীভৎস! কত কদাকর!! জগতের সমস্ত মানুষই কি একই উপাদানে গড়া? ইচ্ছে হচ্ছে ডাবের উপরের পা-টা দিয়ে কষিয়ে এক লাথি মেরে এই মুহূর্তে ফেলে দেয় চোখ বোঁজা ভণ্ড

জগাইকে। সাধুরা যে এত শঠ, এত বদমাইশ বাইরের চেহারা দেখে তা আগে বোঝা তো দূরের কথা, ভাবতেই পারে নি বিন্দু। বুক ঠেলে তার প্লাবনের মতো কান্না আসছিল প্রচণ্ড। হায়! মানুষের ভেতরটা এত অন্ধকার! মনটা এতে পাপময়!? হঠাৎ ভাবনার পরিবর্তন হয় বিন্দুর। এ সে কী ভাবছে? জগাই যে খারাপ তার প্রমাণ কী? সে তো কিছু খারাপ বলে নি, বা করে নি? হয়ত এ সাধনার নিয়মই এই। নিজের জন্য করুণা হলো বিন্দুর। তার মন এত নীচ? সে কেন এত নীচ কথা ভাবল। জগাইকে ভণ্ড ভাবল। ভালো কাজে এসে খারাপ চিন্তা জাগবে কেন? নিজেই ধিক্কার দিয়ে উঠল নিজের মনকে। ভাবছে– না জানি কী হয়? কেন অবিশ্বাস করি? স্বামী যদি ভালো হয়ে যায়? তাই যেন হয় ঠাকুর! তাই যেন হয়। আমি জোড়া পাঁঠা বলি দেবো মায়ের দুয়ারে।
জগাই ভাবে– কীভাবে চোখ খোলা যায়? কীভাবে এই অকৃত্রিম আদিম উদোম সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়? এতদিন যা ছিল সাধনার, আজ তা সামনে। গাছের কুল গাছে ছিল কাঁটায় ঘেরা। আজ তা হাতের মুঠোয়। টুপ্ করে পুরলেই হলো মুখে। কিন্তু পথ পায় না কোনো। হঠাৎ ধক্ করে ওঠে জগাইর মন। সামনে কালীর মতো জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু। চোখ বন্ধ থাকলেও দেখতে পায় স্পষ্ট, সামনে বিন্দু নয় দাঁড়িয়ে, যেন মা কালী স্বয়ং। জগাইর কেমন ভয় করে আবার। একটা পাপবোধ জেগে ওঠে ভেতরে। এ কী করছে সে? যতবার বিন্দুকে ভাবতে যায় ততবার ভেসে ওঠে কালী-মূর্তি। মা কালী যেন তার লাল জিহ্বা বের করে বলছে– সাবধান জগাই। খড়্গের এক কোপে দু'ভাগ করে ফেলবো তোকে। নরমুণ্ডের মালা দেখেছিস্ গলায়? আর একটা মুণ্ডু বাড়বে মালায়। সাবধান। আঁৎকে ওঠে জগাই। ভয় পেয়ে যায়। কী করা যায় এখন? উপায় কী? কেমন করে রেহাই পাবে সে এ অবস্থা থেকে? অমনি 'হর হর ব্যোম ব্যোম' বলে ওঠে– জগাই। তাড়াতাড়ি গোটা দুই গীতার শ্লোক সশব্দে আউড়ে বলে ওঠে এবার তুমি তোমার আসন থেকে নেমে এসো মা কালী। কলার পাতায় রাখা ভস্ম তোমার গায়ে মাখো। বাকিটুকু নিয়ে যাও তোমার স্বামীর জন্য। যজ্ঞ শেষ। জয় বিশ্বম্বর। হর হর ব্যোম ব্যোম। জয় তারা।

সম্বিৎ ফিরে পেল বিন্দু। সত্যিই তো জগাই মহৎ। তার তো কোনো দুরভিসন্দি ছিল না? শুধু শুধু সে সন্দেহ করেছে। দোষ দিয়েছে জগাইর চরিত্রে। কত সন্দেহপ্রবণ মানুষের মন? সন্দেহ হলো মনের ঘুণপোকা। বসে বসে, কুরে কুরে, কুটুস্ কুটুস্ কাটে শুধু। খায়। মনকে ফুঁটো করে দেয়। আর সে ফুঁটো দিয়ে ঝরে যায় মনের যত সার জিনিস। নিজেকে তার তুচ্ছ লাগল প্রচণ্ড। নিজের বোকা বুদ্ধির জন্য তার খুব কষ্ট হচ্ছে এ মুহূর্তে। হঠাৎ তার হুহু করে কান্না পেল। ছিঃ কী ভেবেছে সে গোঁসাইকে? এত হীন কথা ভাবতে পারল সে? হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করে মনে মনে ক্ষমা চাইল সে অপরাধবোধের।
– হে গোঁসাই বাবা, আমি মূর্খ নারী, না বুঝে তোমারে সন্দেহ করছি। আমারে ক্ষমা দিও।
জগাইর কথামতো কিছু ভস্ম গায়ে মেখে বিন্দু বাকিটুকু স্বামীর জন্য নিয়ে বাইরে এলো। জগাই দম ছেড়ে একবুক স্বস্তির নিশ্বাস নিল এতক্ষণে। সন্তর্পণে চোখ খুলল। না, কেউ নেই; গেছে সে। কী ভয়ঙ্কর মুহূর্তরে বাবা? কেউ দেখে ফেলে নি তো আবার? না, কেউ নেই এখানে। আর কখনও ওমুখো হবে না। বাপরে বাপ্! একবার কেউ মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে আবার প্রবেশ করতে চায়? না, আর কখনও না। এবার মন থেকে ধুয়ে ফেলে দিতে হবে বিন্দুকে। মুছে ফেলতে হবে Eraser দিয়ে। এবার সে ভণ্ডামি ছেড়ে চেষ্টা করবে প্রকৃত সাধু হতে। আর নয় পাপের পঙ্কিল পথে পা ফেলা। এবার সে ঠিক পথ পেয়েছে। মুক্তির পথ। যে পথ জ্ঞানের পথ। যে পথ সত্যের। যে পথ গেছে অসীম পানে। ছেলেবেলার মুখস্থ একটা কবিতা তার মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে কবিতাটা যেন তার জীবন। কবিতা তো নয় যেন ওটাই পথ। আর সে পথ তাকে আপনিই টেনে নেয়। উচ্চকণ্ঠে সে কবিতাটি পড়তে লাগল–

পথভোলা তুই পথ পেয়েছিস
যে পথ গেছে অসীম পানে।
সুরহারা তোর সুর মিলেছে
সুর হারানোর গানে গানে।।
আকাশতলে বাতাস জ্বলে
সেই বাতাসে আছিস মিশে।
প্রণয় মাঝে প্রলয় নাচে
তাই দেখে তোর ভয় কী মিছে?
ফাগ-গোধূলির রাগ মেখে মন
সায়ন্তনে যাক না চলে।
মিশবে যদি মিশুক তবে
ওই গহীনের সাগরজলে।।
ডুব দিয়ে মন খুব যতনে
অতল তলে যাক হারিয়ে।
জানবে না যে আনবে খুঁজে

মুক্তো মণি সব কুঁড়িয়ে।।
চিনবি যদি চিনিস তবে
চিন্তামণির আবাসখানি।
শুনবি যদি শুনিস তবে
শ্রবণভ'রে অভয় বাণী।।

গায়ে শাড়ি জড়িয়ে বিন্দু যখন বাড়ির দিকে রওনা দিল তখন ফিকে হয়ে আসছে ভোরের আকাশ। শুকতারা বাদে আর সব তারা গেছে মিলিয়ে। মেঘও নেই। বৃষ্টিও হয় নি একটু। বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গোবিন্দর বউ অবলা যাচ্ছিল ঘাটে। সে দেখে ফেলল– আশ্রমের দিক থেকে বাড়ির দিকে ফিরছে বিন্দু। সন্দেহ জাগল তার মনে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলছে বিন্দু। পাছে কেউ দেখে ফেলে, এই ভয়। শুকতারাটাও যেন পিটপিট করে দেখছে তাকে। তা দেখুক, সে তো কোনো খারাপ উদ্দেশে যায় নি ওখানে? কিন্তু বুক তবু দুরুদুরু করে। ওদিকে শ্যামলী ঘুম ভেঙে মাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করে। না পেয়ে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। দেখবে মা কোথায়। অবশেষে যখন দেখল, মা পুকুরপারের আশ্রমের দিক থেকে ফিরছে, তখন সে আশ্চর্য হলো। দ্রুত চুপিচুপি ঘরে ঢুকে গিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। জানতে দিল না সে দেখে ফেলেছে রাত্রিশেষে তার মায়ের ফেরা।

The Most melodious song
will never been heard,
The most beautiful Sight
will never been seen,
The most enjoyable time
will never Come to life,
Life goes on his own way.

দেখতে দেখতে চলে গেল কয়েকটা মাস। ফিল্টারের পানির মতো নিঃসঙ্গতার নৈঃশব্দ চুঁইয়ে ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা সময়। শীতের পাতারা ঝরল। বসন্তে আবার গজাল। গ্রীষ্মের নিদাঘ তাপে আবার শুষ্ক হলো। খেত-খামারে সবুজ ধানের চারা বেড়ে উঠল কিশোরীর মতো। পাটের বীজ অঙ্কুরিত হলো। যুদ্ধের দামামা বাজল দেশে। কিন্তু ঝড়ুগোপালের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। ও যেন বাজপড়া গাছ। সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ অক্ষম। জীবন্ত নয়। স্বামীর জন্য অধিক ভালোবাসাই স্বামীর প্রতি ঘৃণা জন্মিয়েছে বিন্দুর মনে। সারাক্ষণ স্বামীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে এ কষ্ট বিন্দুর কাছে এখন দুঃসহ এবং অর্থহীন মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবেও– এমন অথর্ব, পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে সে কী করবে? এভাবে বেঁচেই বা কী লাভ? আবার ভাবে– কার না বাঁচতে ইচ্ছে করে? এ সংসারে সবাই ভাবে সুদিন আসবে, এর চেয়ে ভালো থাকবে। অথচ আসে না সুদিন। বিন্দুও ভাবে। ভাবে- কোনো এক অলৌকিক বা ঐশ্বরিক উপায়ে একদিন ভালো হয়ে উঠবে তার স্বামী। সুস্থ হবে। আবার ফিরে আসবে সুখ। অথচ বিন্দু ভাবেও নি একবার– পৃথিবীতে সুখের বড় অভাব। কতটুকু সুখে যে মানুষ সুখী হয়, তা কেউই জানে না। সুখ সুখ করে মানুষ শুধু সুখপাখি খোঁজে। অথচ পায় না।

‘সুখ নামের শুকপাখিটা ধরতে গিয়ে
কিনেছি সোনার খাঁচা যা কিছু সব বিকিয়ে
সোনার শিকল কেটে দিয়ে হায়
সে পাখি আমার যায় উড়ে যায়
ভাবি নি সেই সে আশার এই পরিণাম।’

বৈশাখের শুরুতেই এক সকালে টুপ্ করে মরে গেল ঝড়ুগোপাল।

Life is nothing but
A grefful walking Shadow

'বিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর'। প্রিয়জন মরে গেলে দীর্ঘস্থায়ী হয় না কারও দীর্ঘশ্বাস। চোখের পাতা ফেলে না কোনো মেঘের ছায়া। জীবনটা একটা দুঃস্বপ্ন। মৃত্যু তার অবসান। জীবন তো যন্ত্রণাময় চলন্ত ছায়া। যান্ত্রিকতার এই যুগে যন্ত্রণাও যাঁতাকলে পেষা। স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা সবই ক্ষণস্থায়ী। নিরেট শোকেও এখন ভেজাল। মানুষ শোককে সুখ ভেবে আঁকড়ে থাকে না। তাই যত তাড়াতাড়ি স্মৃতির ঘাড়ে ধুলো জমে ততই ভালো। অবশ্য তবুও মানুষ মাঝে মাঝে পুরনো পুতুলের মতো ধুলো ঝেড়ে বের করে আনে স্মৃতি। রোমন্থন করে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এর মূল্যও তো কম নয়?

ঝড়ুগোপালের মৃত্যুতে কেউ শোক পেয়েছে, এমন হয় নি। বউ শুধু দীর্ঘশ্বাস ঝাড়ল। জলও দেখা দেয় নি চোখে এক ফোঁটা। সে অবশ্য অন্য কারণ। না বাঁচাই ভালো। স্বামীকে তার ভেজা, নোংরা একখানা ছেঁড়া কাঁথা মনে হতো, যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। নিজেরও কোনো কাজে আসছে না, অন্যেরও না। তাই মৃত্যুটা সুখের না হলেও শোকের নয়। সবাই বলল– এ ভালোই হয়েছে। এত কষ্টের চেয়ে মৃত্যুই ভালো। কিন্তু দু'চারজন যে ভিন্ন সুরে গান ধরে নি এমন নয়। সব পাখি একই সুরে গান করে না। বিচিত্র মানুষের মন। বিচিত্র তার গতি। মন যেন তরল জল। ঢালু পেলেই গড়ায়। ফাঁক-ফোঁকর খোঁজে। আর সুযোগ পেলেই ভেতরে প্রবেশ করে প্রলয় ঘটায়। বিন্দুর চোখে জল না দেখায় দু'চারজন মুখরা রমণী মুখ টিপে হেসেছে। ঘাটে কিংবা কলতলায় বসে আলাপের সময় বলেছে–

'বিন্দি মাগির আক্কেলটা দেখলি তোরা, স্বামীডা
মরলো, এক ফোঁটা জলও পড়লো না চোখ দিয়া?
নিকষা মাগি? কতায় কয় না– মরছে যার ভাতার,
চোহে তার অকূল পাতার? তা না খাবি লো খা, স্বামীডারে খা?

পুকুরঘাটে এরকম এক রমণীসভায় গোবিন্দর বউ অবলা ছিল উপস্থিত। কথায় বলে– নারী হলো নড়লি ছাড়া জাত। মুখে কিছু আটকায় না। পেটে কথা থাকে না। আঁচলের খুঁট থেকে একটু দোক্তা বের করে মুখে ফেলে বলে উঠল–

– এবারে রাস্তা পরিষ্কার। স্বামী থাকলে ফস্টিনস্টি করবে ক্যামনে? নাগরের গলা জড়াইয়া এবার দোলায় দোলতে পারবে।

কথাটার ভেতর শ্লেষ খুঁজল সবাই। বিষয়টা জানার জন্য রমণীমহল কেঁচো খুঁড়তে শুরু করল। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। তাও জাত কেউটে। যে সাপ সেখানে ছিলও না কোনোকালে। জগাইর আশ্রম থেকে বিন্দুর বেরোনোর কথা বেরিয়ে পড়ল কথায় কথায়। শুধু কি তাই? বিন্দু রোজ রাতেই যায়। অবলা নিজে দেখেছে। জগাইর সাথে বিন্দুর পিরিত। ফলে কথাটা রমণীমহলে একটা স্থায়ী বিশ্বাসের রূপ নিল।

I am integral with you
I too I am of one phase
and of all phases

ঝড়ুগোপালের মৃত্যুর পর বিন্দুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। প্রথম ভেবেছিল এত ভোগার চেয়ে মরাই ভালো। কিন্তু চোখ এখন অন্ধকার। ছেঁড়া ছাতায় বৃষ্টি মানে না ঠিকই, কিন্তু বাতাসের ঝট্‌কা কিছুটা হলেও প্রতিহত হয়। ঝড়ুগোপাল যেন এ সংসারে মাথার উপর ছেঁড়া ছাতার মতোই ছিল। এখন তাও না থাকায় চোখে হতাশ দেখছে বিন্দু। কোনো আশার আলো নেই। অবশ্য প্রায়ই খোঁজ খবর নেয় সাধন। সে-ই যেন এখন এ পরিবারের অভিভাবক। তবে এ মৃত্যুতে সাধন বেশ ভেঙে পড়েছে। এ ছাড়াও খোঁজখবর রাখে তপন। এ মৃত্যুতে তার যেন একটু সুযোগই হয়েছে। আরণে-আকরণে সকারণে-বিকারণে সে ঘন ঘন আসতে পারছে। মৃত্যু যেন প্রবেশপত্র। প্রেমের ঘরে অবাধ বিচরণের পাশ। এভাবে, সেভাবে, নানাভাবে সাহায্য করছে সে এ পরিবারকে। শ্যামলীর স্কুলে যাওয়া অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে। ওদিকে শ্যামলী আর তপনের অবাধ মেলামেশার ফলে তপনকে নিয়ে পাঁচকথা ওঠে গ্রামে। দেখতে অবশ্য ছেলেটা ভালো। ধনীর ছেলে। এ সব কারণে ছেলেটাকে বিন্দুর বেশ পছন্দ। সাধনের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে সাধনও সম্মতি জানায়। ফলে তপন আর শ্যামলীর অবাধ মেলামেশায় বিন্দু কিছু মনে করে না।
কিন্তু ফুল ফুটলেই গন্ধ ছড়ায়। সে প্রেমেরই হোক, আর পাপেরই হোক। কথাটা জানাজানি হতে সময় লাগে নি বেশি। যেখানে সেখানে এ মুখরোচক খবরটি যখন তখন আলোচিত হয় রসিয়ে রসিয়ে। বিন্দুর নাম জড়িয়ে খবরটি এ রকম দাঁড়ায় কলতলায়–

> ‘গতরখাগি মাগির মাইয়া না? যেমনি মা তেমনি বেটি।
> কুলটার বেটি কুলটাই হয়’।

তপনের বাবা-মার কানে যেতেও বেশি সময় লাগল না এ কথা। ছেলেকে ডেকে একদিন দু’চারপাঁচ কথা শুনিয়ে দিল তার বাবা–
এ কী কথা শুনি? সাবধান কইরা দিতেছি তোমারে, ওই ছোটলোক নীচু জাতের মাইয়া আনতে পারবো না কোনোদিন এ ঘরে। ও নষ্ট কুলটার মাইয়া কুলটাই হয়। যদি আমার কতা না শোনো তাইলে তোমারও জায়গা অবে না এ ঘরে।

তপন বুঝল বিষয়টা জটিল। জাত-পাতের প্রশ্ন। সমাজ এমন এক বেড়া সৃষ্টি করেছে যা ডিঙিয়ে মনের গরু ওপাশে ঘাস খেয়ে আসে গোপনে। অথচ প্রকাশ্যে পাপ। এ বেড়া কেউ ভাঙেও না। চেষ্টাও করে না। কী করে সমাজ উঁচু-নীচুর মাফকাঠি নির্ধারণ করল? প্রেম কি এ সব মানে? মেনেছে কোনোকালে? কখনও? ভালোবাসার কি জাত থাকে? তবে কেন এ জাতের বড়াই? তবে কেন এ বিভাজন? বিষিয়ে ওঠে তপনের মন। ভালোবাসা এক ভিন্ন জিনিস। এ আপনি হয়। অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয় ভালোবাসার বীজ। এতে কেন বাধ সাধবে সমাজ? যতই তপন ভাবে, ততই বাঁধ-দেয়া জোয়ারের জলের মতো ফুঁসে ওঠে তপনের মন। শ্যামলী ছাড়া তপন যেন মরুভূমি। মনে মনে শ্যামলীকে পাবার বাসনা তার প্রবল হলো আলো।
একদিন সময়মতো বিন্দুর কানে কথাটা তুলল তপন। জানাল তার বাবার অমতের কথা। চোখে হতাশা দেখল বিন্দু– তহলে তার মেয়ের কী হবে? তপন বলল–
– বাবা যদি মেনে না নেয় এ বিয়ে, যদি বাড়িতে জায়গা নাও দেয়, তবু আমি বিয়ে করবো শ্যামলীকে। না হয় আপনার বাড়িতেই থাকবো।
শঙ্কিত হলো বিন্দু। সমাজ তাহলে তাকে একঘরে করে রাখবে। তাছাড়া মেয়ে জামাই-ই বা কী খেয়ে বাঁচবে? সম্পত্তি তো কিছু নেই বলতে গেলে? বিন্দু রাজি হলো না। বলল– না বাবা, তা অয় না। মাইনসে কী কবে? তোমার বাবা-মারে কও, তাগো বুঝাইয়া কাম করো, নইলে মাইয়াডার আমার কী অবে?
তপন কী করবে ভেবেই পেল না। বাবা-মা কোনোমতেই মেনে নেবে না এ বিয়ে। বিন্দু রাজি হলেও সমাজ দেবে বাগড়া। বিয়ে করে অন্য কোথাও গিয়ে খাওয়াবেইবা কী? যতই ভাবে এসব শ্যামলীকে পাবার জন্য, ততই পাগল হয়ে ওঠে মন। ইচ্ছে হয় পালিয়ে যায়। নিয়ে গিয়ে ওঠে মেসে। শ্যামলীকে গিয়ে জানাল বিষয়টি।

Prevention is better than cure.

এক সকালে ঘুম থেকে উঠে বিন্দু দেখে– শ্যামলী বিছানায় নেই। এত সকালে তো ঘুম থেকে ওঠে না সে কখনও? গেল কোথায়? খুঁজল। পেল না। অপেক্ষা করল। এলো না। আবার খুঁজল। ধৈর্য হারাল। চট করে মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। গতকালই তো শ্যামলীকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল তপন? তাহলে কি...? বুঝতে আর বাকি থাকল না বিন্দুর কী ঘটেছে। মাথায় বাজ পড়ার মতো মুষড়ে গেল বুকটা। চোখে অন্ধকার দেখল। শেষে কিনা এই করল? পেটে পেটে এত কিছু? ছুটে গেল বিন্দু। প্রথমেই গিয়ে সাধনকে জানাল ব্যাপারটা। সাধন বিমূঢ়। চেতনারহিত। স্থবিরতা ভর করল তার মাথায়। এ সে কল্পনাই করে নি কখনও। শ্যামলীর মতো মেয়ে এতটা পারবে সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। তার মাকে ছেড়ে চলে গেল? তার কাকাকে ছেড়ে চলে গেল? সমাজ সংসার সব ছেড়ে? সব? সাধন ভাবছে– প্রেম কী? প্রেম পর করে, না আপন করে? একজনকে আপন করে, দশজনকে পর করে। একজনকে হাসাতে গিয়ে দশজনকে কাঁদায়? অর্থাৎ এক জায়গার জল অন্য জায়গায় গড়িয়ে যায়। কিন্তু জল জলই থাকে। তাই বলে মাকে ছেড়ে চলে যাবে শ্যামলী? জীবন সম্বন্ধে আর একবার হতাশ হলো সাধন। তার ইচ্ছের মূল্য কেউ-ই দেয় না। কেউই তাকে পাত্তা দেয় না। কুকুর বিড়াল থেকে শুরু করে শ্যামলী পর্যন্ত। ঝড়ুগোপাল থাকতে তো শ্যামলী চলে যায় নি? নড়তে চড়তে পার তো না, তবুও শ্যামলী তাকে মানতো। অথচ সাধনকে সে মানল না? সাধনের মনে হলো, তার মেয়ে তাপসীও এমনি করে চলে যাবে একদিন। মানবে না তাকে। জানাবে না কাউকে। জানবে না কেউ। পালিয়ে যাবে। ডানা গজালেই উড়াল দেবে পাখি। সাধন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাপসী উড়ছে। আকাশে। সাধন হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আকাশে। তাপসী ক্লাসে সেভেনে এবার। কিশোরী। যুবতীর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় নি এখনও। আর তিন বছর পর ক্লাস টেনে উঠবে সে। শ্যামলীর ক্লাসে। শ্যামলীর সমান হবে। যুবতী হবে। দেখতেও ডাগর হবে। এবং তাকে না জানিয়েই কোনো ব্রাহ্মণ যুবকের হাত ধরে পালিয়ে যাবে কোনো এক রাতে। সেই গানটা মনে পড়ল সাধনের। হাসন রাজার গান–

মাটির পিঞ্জিরা মাঝে বন্দি হইয়ারে
কন্দে, হাসন রাজার মন মুনিয়ায়রে।।
পিঞ্জিরা সামাইয়া ময়না ছটফট ছটফট করে
মজবুত পিঞ্জিরা ময়না ভাঙ্গিতে না পারেরে।।
উড়িয়া যাইবো মুনিয়া পাখি পইড়া রইবো কায়া
কীসের কায়া, কীসের ছায়া, কীসের মায়া-দয়ারে।।

কিন্তু কোনো ব্রহ্মণ যুবক তো আর নেই? তপনই একমাত্র ছেলে। এবং যুবক। ভাবল– যারা কিশোর আছে, তারা যুবক হবে? কিন্তু তাদের বংশের অন্যান্য ছেলেরা তাপসীর চেয়ে বয়সে ছোট। একটা নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ভাবল– যাক বাঁচা গেল। পরক্ষণেই ভাবল– ছোট? আজকাল তো বড় বড় মেয়েদেরও ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে হয়? বয়সের কোনো বালাই নেই। হঠাৎ মনে হলো, ব্রাহ্মণই হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। নমঃশূদ্রতও তো হতে পারে, খ্রিষ্টানের ছেলেও হতে পারে, মুসলমানও হতে পারে, মুচির ছেলেও তো হতে পারে? অমনিই ঝ্যাৎ করে উঠল সাধনের কান। তপ্ত তামার উপর যেন এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়ল। মুচির ছেলে? সর্বনাশ? মুচির ছেলে অসীম তো ক্লাস নাইনে পড়ে? তার সাথে মাঝে মাঝেই তাপসীকে হেসে কথা বলতে দেখে। সে ধরেই নিল, এখন থেকেই দু'জনের ভেতর যেন কী পিটিস্ পিটিস্ চলছে। নীলাকাশে দেখতে পেল ছোট্ট একখণ্ড ঘনকালো মেঘ। স্পষ্ট দেখতে পেল সে তিন বছর পরের দৃশ্য– যুবতী তাপসী শাড়ি পরেছে বাসন্তীরঙা, অসীম লুঙ্গি। ঠোঁটে গোঁফের রেখা। দু'জনে মুখোমুখি বসে। গোধূলির আলোতে রাস্তার কাছে কাশ ঝোঁপের পাশে, নিভৃত স্থানে, নদীর পারে হাত ধরাধরি করে হাসছে। রাগে কাঁপতে লাগল সাধন। না, আর বাড়তে দেয়া ঠিক নয়। আজ রাতেই হয়তবা পালিয়ে যাবে ওরা। আর দেরি নয়। সময় থাকতেই শাসিয়ে দেয়া দরকার। কঠোর কণ্ঠে সাধন ডাক দিল তার মেয়েকে– তাপসী, তাপসী, শোন, শিগগির এদিকে আয়। এ ডাক তাপসী কখনও শোনে নি। তাই চমকে উঠল সে। দ্রুত চলে এলো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল–

বাবা, ডাকছো ক্যান?

কেমন যেন একটু কেঁপে গেল তার গলাটা। সাধন সম্বিৎ ফিরে পেল হঠাৎ– তাই তো ডেকেছে কেন তাপসীকে? কোনো কারণ খুঁজে পেল না। কিন্তু রাগ অহেতুক হলে পড়ে না, তা আরও বেড়ে যায়। সাধনেরও সেই অবস্থা। বলল–

– শোন, ওই মুচির ছেলে অসীমের সাথে তুই আর মিশতে পারবি না। আর মিশবি তো একেবারে ঠ্যাং ভাইঙ্গা দেবো। যা এখোন।

তাপসী চলে গেল। কিন্তু অসীমের সাথে তাকে মিশতে নিষেধ করল কেন, তা সে কিছুই বুঝল না। তার বাবার রাগের কারণও বুঝতে পারল না। ওদিকে বিন্দুরও চক্ষু চড়কগাছ। কীসের মধ্যে কী? সে বলল কী আর সাধন করল কী? তাপসীর দোষ কী?

কথায় বলে– বাতাসের পাঁচ পা। ঘটতে দেরি আছে, ছড়াতে দেরি নেই। ইতোমধ্যে সারাগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। নমশূদ্রের কুলটা মেয়েকে নিয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে ভেগেছে। এ কথা শোনার পর তপনের বাবা কালীপদ ভট্টাচার্য রাগে অষ্টবক্র মুনি হলেন। জাত, মান রসাতলে গেল তার। তাই ছেলেকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলেন। গ্রামের সবার মুখে এ খবর সুস্বাদু চাটনি হয়ে

ফিরতে লাগল। যাদের যুবতী মেয়ে আছে তারা সাবধান হলো। যাদের কিশোরী মেয়ে আছে তারা শঙ্কিত হলো। পথে ঘাটে মাছের বাজারে এখন একটাই খবর। জগাইর কানে সে খবরটা গেল না, এমন নয়। গ্রামের সদর ছেড়ে আখড়ার অন্দরেও পৌঁছে গেল এ খবর। সেই অমাবস্যা রাতের ঘটনার পর জগাই আর এ বাড়িমুখো হয় নি লজ্জায়। তবে ঝড়ুগোপাল মারা গেলে দু'একবার এসেছিল সে এ বাড়ি। হাজার হোক একই গ্রামে বাস তো? তারপর বন্ধ যাতায়াত। বিন্দুকে জড়িয়ে তাকে নিয়ে পাঁচকথা ওঠার পর সে আর কোথাও বেরোয় নি তার আশ্রম ছেড়ে। তার মনে বড় ধরনের একটা পাপবোধ জন্মেছে। পাপের সে বীজ ক্রমশঃ কাঁটায় ঘেরা বৃক্ষ হয়ে তাকে এখন আঁচড় কাটে, ক্ষত-বিক্ষত করে। তার জন্যই তো বিন্দুকে আজ লোকে কুলটা বলে? ব্যাপারটা এত চুপিচুপি করতে চেয়েছিল, তা-ও মানুষে টের পেয়ে গেল। শালার মানুষের চোখ, না যেন প্যাঁচার চোখ। যত গোপনই হোক, মানুষ তা টের পাবেই। পৃথিবীর সব গোপনই যেন প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। আর মানুষও যেন মাছরাঙা পাখি। চুপ্ করে বসে থাকে জীবনের মগডালে। সুযোগ বুঝে ঝুপ্ করে পড়ে। ঠোঁটে তার মাছ। আশ্চর্য!

The Sun is a new Every day,

You Cann't dive Twice
in the Same river.

গোটা পরিস্থিতি আলোচনা করে তপন যখন কোথাও পালিয়ে যাবার প্রস্তাব জানাল, কোনো দ্বিধা না করেই রাজি হয়ে গেল শ্যামলী। তখন মনে তার একটা রোমাঞ্চ খেলে যাচ্ছিল। অজানা আকর্ষণে পুলক লেগেছিল মনে। কিন্তু চলে আসার পরই বুঝতে পারল– মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। অন্তবিহীন পথ। এতই কি জরুরি ছিল বেরিয়ে আসার? আর একটু ধৈর্য ধরা গেল না? তপন তো তারই? তাদের নামে কত কুৎসা যে রটবে? আর তো ফেরার উপায় নেই? মোম তো জ্বলতে জ্বলতেই গোড়ায় পৌঁছায়। আর খুঁজে পাওয়া যায় না সে পথ। পায় না। ভুলে যায় সে পথ। সৃষ্টি হয় নতুন পথ। যে যায়, সে দীর্ঘ যায়; আর ফেরে না। ফিরে আসে না। আমরা কেউই ফিরি না। ফেরা যায় না।

বাস থেকে ওরা নামল যখন, তখন বেলা হয়েছে, ওরা নাস্তা করতে ঢুকল সস্তা এক হোটেলে। হোটেলে শ্যামলীর এই প্রথম। শ্যামলীর অনেক কিছুই এই প্রথম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে কোনো যুবকের উপর নিজকে সঁপে দেয়া এই প্রথম। অজনা জীবনে পদার্পণ এই প্রথম। পেটে ক্ষিধে আছে। রুচি নেই। কেমন যেন লাগছে শ্যামলীর। ভাবে, চিন্তা করবে না মোটেই। পারে না। রুটি চিবুতে চিবুতে তপন বলছে–

শ্যামলী, ভেবো না। পথে যখন নেমেছি; পথই তখন পথ দেখাবে আমাদের। তোমাকে আমি পেলাম, আরও বেশি করে পাবার জন্য। হারানোর জন্য নয়। এ পাওয়াই সব পাওয়া নয়। মানুষ ভালোবাসে পাওয়ার জন্য। পেলে, ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। আমি তোমাকে ভালোবেসে পেলাম আরও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। তুমি আমার; তুমি যেন আরও বেশি করে আমার হও; তুমি যেন 'আমি' হয়ে উঠো।

চারজনের ছোট্ট মেস। তিন রুমের একটা ঘরে ওরা চার বন্ধু থাকে। এক রুমে দু'জন করে। অন্যটা রান্না-খাওয়ার জন্য। একটু ছোটমতো। সবুজের সাথেই ভাব বেশি তপনের। একই রুমে থাকে ওরা দু'জন। অন্যরুমে থাকে ধীমান আর সঞ্জয়। এই ওদের ছোট্ট মেস। বেশ কিছুদিন ধরে কাজের বেটি আসে না। নিজেদের রান্না করে খেতে হয়। তাই পথে পথে বুদ্ধি করেছে সে কথা। বলবে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ওকে নিয়ে আসছে। দূর সম্পর্কের বোন।

শ্যামলীকে নিয়ে তপন এসে হাজির। সবাইকে ডেকে তপন শ্যামলীর কথা বলল। কোনো অসুবিধা নেই। থাকবে রান্না ঘরেই। সবাই মেনে নিল এক বাক্যেই। দেখল যে রান্নার ঝামেলাটাও থাকল না। তাছাড়া একটা যুবতী মেয়ে। দেখতে শুনতে ভালো। শুধু কয়েকটা ছেলে থাকে। জীবনটা একদম নিরামিষ হয়ে পড়েছে। জমবে বেশ। গুঁড় দেখলেই পিঁপড়ে এসে জমে। আর এখানে তো গুঁড় নিজেই এসে পিঁপড়ার কাছে হাজির। এদের মধ্যে কেউ মনে মনে এতক্ষণে তাকে প্রেয়সী ভাবতে শুরু করেছে। সকলের ভেতরই একটু ফুর্তি ফুর্তি ভাব। শ্যামলী বহাল হয়ে গেল।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল। যে কারণে ব্যাচেলরদের বাসা দিতে চায় না শহরের লোকে। উঠতি যুবকদের মাঝে কাঁচা একটা যুবতী মানে মধুর চাক। মৌমাছি যুবকরা সারাক্ষণ কারণে অকারণে ঘুরঘুর, গুন্‌গুন্‌ করতে থাকে মৌচাক ঘিরে। কলেজও কামাই হতে লাগল মাঝেসাজে কারো কারো। শরীরটা ভালো নেই বা পেট ব্যথা কিংবা গা জ্বরজ্বর ইত্যাদি নানা ছলছুঁতো করে মাঝেমাঝেই থেকে যেত দু'একজন বাসায়। অস্বস্তি লাগলেও কখনও প্রকাশ করত না শ্যামলী। যুবকরা যেন সম্প্রতি জোয়ারের পুটি হয়ে উঠেছে। শ্যামলী জোয়ারের জল। মনের অন্দরে মন ঝটফট করছে যুবকদের। অশ্লীল জিনিসগুলো যেন মনের অন্দরমহলেই শোভা পায়। বাইরে বেরিয়ে এলেই দুর্গন্ধ ছড়ায়। কিন্তু সকলেই খেয়াল করছে যে, তপন একটু বেশি মেশে, একটু বেশি ঘেঁষে শ্যামলীর সাথে। তাদের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকে বিষয়টা। এরকমই হয়। কোনো যুবক কোনো যুবতীর সাথে মিশতে চেয়ে বা ভালোবাসতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হয়, তখন সেই যুবতীর সাথে অন্য কাউকে মিশতে দেখলেই সন্দেহের চোখে দেখে। ঈর্ষায় জ্বলে। যুবতীকে নষ্টা মনে হয়। দুশ্চরিত্রা! কিন্তু ওই যুবকই যদি মিশতে পারত যুবতীটির সাথে, তখন সে আর নষ্টা হতো না। হতো অপরূপা, অতুলনীয়া, সতী, সাধ্বী। অন্য বন্ধুরা তাই তপনের প্রতি ঈর্ষা বোধ করতে লাগল। ঈর্ষার অঙ্কুর বড় দ্রুত গজায়। বাড়ে তার চেয়ে দ্রুত। আর ছেয়ে যায় কাঁটায় কাঁটায়। তপনকে তারা সন্দেহ করতে শুরু করল। পাতায় পাতায় লক্ষ্য করতে লাগল তপন আর শ্যামলীকে।

আমি জলের মাঝারে বাস করি

তবু তৃষায় শুকায়ে মরি

শ্যামলী আসার পর যুবকদের ভেতর প্রাণের জোয়ার এলেও বন্ধুত্বে ভাটা এলো। আপনা থেকেই কবে যেন তপন একটু আলাদা হয়ে গেল তাদের থেকে। বন্ধুত্বের কোথায় যেন একটা সীমারেখা টানা হয়ে গেল। একে অপরকে দেখলে সহজ হতে পারছে না। তপন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বুঝতে বাকি নেই শ্যামলীরও।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে একদিন সবুজ দেখল– তপন নেই বিছানায়। মাথায় চড়াক করে সন্দেহ এলো– তাহলে শ্যামলীর ঘরে যায় নি তো তপন? পা টিপে টিপে উঠল। শ্যামলীর ঘরের দিকে সন্তর্পণে গেল। দরোজায় কান পাতল। না, কোনো শব্দ নেই। বেড়ার গায়ে একটা ছিদ্র খুঁজল। যেন সেই ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসবে তপন আর শ্যামলীর পাপ। জীবনের ছোটখাটো ছিদ্রপথেই বেরিয়ে আসে জগতের যত পাপ। ছিদ্র পেল। ঢিব্‌ঢিব্ করছে বুক। চোখ রাখল। দৃষ্টি স্থির হলে যা দেখল, তা সে সত্যি আশা করে নি। দেখল– শ্যামলী কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। তপন নেই। তাহলে? তপন গেল কোথায়? পরক্ষণেই মনে হলো বোকার মতো কী ভুলটাই করেছি। তপন তো বাথরুমে যেতে পারে? তাই তাড়াতাড়ি রুমের দিকে ফিরল যাতে তপন আসার আগেই সে শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ততক্ষণে তপন বাথরুম থেকে ফিরে দরোজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে। সে খেয়ালই করে নি যে সবুজ বিছানায় নেই। দরোজায় মৃদু ঠেলা দিয়েই বুঝতে পারল সবুজ– সর্বনাশ হয়েছে। তপন শুয়ে পড়েছে খিল এঁটে। এখন উপায়? ডেকে এখন কী বলবে তাকে? বাথরুম তো একটা। তাতে তপন গিয়েছিল। অতএব, সে কথা বলা যাবে না। এত রাতে কোথায়ইবা যাবার কথা বলবে সে? এ সব ভাবতে ভাবতে দরোজায় ধাক্কা দেয় সবুজ। ফিরতে একটু দেরি করেই ফেলেছিল সে। দরোজায় দাঁড়িয়েও ভাবছিল কিছুক্ষণ। এরই মধ্যে একটু তন্দ্রাও এস্‌ছিল তপনের। চোখ খুলে পাশের চৌকিতে তাকাল। সবুজ নেই। ধক্ করে উঠল মনটা। সবুজ তাহলে কোথায় গিয়েছিল? কখনইবা বাইরে গেল? তপন তো নিজেই দরোজা খুলল? সবুজ তাহলে নিশ্চয়ই তার পরে বেরিয়েছে? বাথরুমে তো তপন ছিল? সবুজ গিয়েছিল কোথায় এত রাতে? নানা প্রশ্ন একই সাথে মনে এসে ভিড় করছে। একটা সন্দেহ এসে উঁকি মারছে মনে। সন্দেহপ্রবণ মানুষের মন ছিদ্র খোঁজে। একটু ছিদ্র পেলেই সন্দেহের বীজ বোনে। ঘটনার একটু প্যাঁচ পড়লেই মনও প্যাঁচে প্যাঁচে ঘোরে। প্যাঁচ খোঁজে। আর তাতেই দফারফা। মনও যায় পেঁচিয়ে। মন যেন নুডল্‌স। খেতে সুস্বাদু। কিন্তু প্যাঁচ। মনও ভালো। কিন্তু প্যাঁচে চলতে আরাম পায়। তপন তাই ধরে নিল– সবুজ নিশ্চয়ই শ্যামলীর ঘরে গিয়েছিল। মাঝেমাঝেই তাদের দু'জনকে বেশ কৌতুক ও হাসাহাসি করতে দেখা যায়। শ্যামলী ও সবুজের প্রতি এ মুহূর্তে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল সবুজের মন। সবুজের প্রতি ভীষণ ঈর্ষা বোধ করতে লাগল। সবুজ তার চেয়ে দেখতে সুন্দর, হ্যান্ডসাম। বড়লোকের ছেলে। ঠাট আছে। আর তাই দেখে ঢলে পড়ল শ্যামলী? ঈর্ষা এমন এক সুন্দর ছোবল যা মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলে তিলে তিলে দহন করে নিরন্তর। অক্সিএসিটেলিন শিখার মতো জ্বালিয়ে মারে। ঈর্ষা তীব্র এক অগ্নিশিখা যা থেকে লক্ষ লক্ষ শিখা জন্ম নেয় এবং নিয়ত নিঃশব্দ করে চলে তীব্র দহন।

দু'বার দরোজায় ধাক্কা দেয়াতেও দরোজা না খোলাতে ওর বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল। তপন প্রশ্ন করলে কী বলবে? যদি সন্দেহ করে বসে? সত্যি কথাইবা বলবে কী করে? তপনইবা দরোজা খুলছে না কেন? এর মধ্যে তো ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়? তাহলে কি ওকে শ্যামলীর ঘরের দিক থেকে আসতে দেখেছে? কোনো প্রশ্ন বা উত্তরই ঠিকভাবে গোছাতে পারল না সবুজ। ভাবল– যা হয় হবে, দরোজা তো খুলুক। এই ভেবে তৃতীয়বার যেই দরজায় ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল তখনই ভেতর থেকে দরোজা খুলে দিল তপন। সবুজ ঢুকে 'ধরা পড়ে গেছি' গোছের একটা ভাব করে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। তপন এক পলক দেখে নিল মুখটা এই অন্ধকারের আলোতেই। তারপর দরোজা বন্ধ করে কোনো প্রশ্ন না করে, যেন কিছুই বোঝে নি এমন ভাব করে শুয়ে পড়ল আবার। দু'বিছানায় দু'জনে পড়ে থাকল ঘুমের ভান করে। ঘুম এলো না আর কারোই।

চীর চন্দন হার ঊরে না দেলা,

সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।।

ভোর হলো। কিন্তু তপনের মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গলায় কাঁটা ফোটার মতো একটা অদৃশ্য অস্বস্তি তাকে বিদ্ধ করে আছে। যাকে আরও বেশি করে পাওয়ার জন্য কাছে আনা, সে-ই যেন দূরে সরে যাচ্ছে আরও। বলাও যায় না এ কথা কাউকে। পরদিন আগেভাগেই ঘুম থেকে জেগে বাইরে চলে গেছে সবুজ। শ্যামলী যতই হেসে কথা বলে তপনের সাথে, তপনের মনে হয়– এ তার বাড়াবাড়ি। শ্যামলীর হাসিগুলো তার মনে ভাঙা চুড়ির মতো খঁচ্ করে বিঁধে। আর তাতে ভেতরে ভেতরে নিয়ত নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ চলে ঘটে। আজকের দিনের তপনের অস্বস্তি শ্যামলীর চোখ এড়াল না। শ্যামলীর মনটা হঠাৎ হু হু করে উঠল– তপন ওরকম কেন করে? সে কি কোনো অন্যায় করে ফেলেছে? মনে শঙ্কা ও ভয়। কিন্তু সারাদিন কখনওই নিভৃতে পেল না সে তপনকে। শ্যামলীও গভীর উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণায় কোনোমতে দিনটি কাটাল।

তপনের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে সবুজ। তাই একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আর তাতে সন্দেহও ঘনীভূত হয়। বিকেলে কোথাও বেরিয়েছে সবুজ। ফেরে নি তখনও। তপনেরও ভালো নেই মন। সে বের হয় নি। আলোও জ্বলে নি ঘরে। অন্ধকারই যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখবার উত্তম স্থান। লক্ষ্য করেছে শ্যামলী, সবুজ কোথায় যেন গেছে। তপন একা ঘরে। সাহসে ভর করে সেই সুযোগে ঢুকে পড়ল তপনের ঘরে। চিৎ হয়ে শুয়েছিল তপন। কিছু ভাবছিল। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল–

– 'কে? ও, তুমি? কী চাও?

এ স্বর, এ সুর শ্যামলীর অচেনা। এমন করে তো কখনও তার সাথে কথা বলে না তপন? তাহলে? বিহ্বল হলে পড়ে শ্যামলী। বিমর্ষ হয়ে যায়। বলে–

তুমি অমন করছো কেন? কী হয়েছে তোমার? আমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে না খুব?

তপন কোনো কথা না বলে ওই অন্ধকারেই শ্যামলীর মুখে তীর্যক দৃষ্টি বিদ্ধ করে পাশ ফিরে শুলো। ব্যাধের তীর যেমন পক্ষিণীকে বিদ্ধ করে, তেমনি বিদ্ধ হলো শ্যামলী। আহত হলো। রক্তক্ষরণ হলো আবার অন্তরে। এ কেমন দংশন? বিষ নেই অথচ জ্বালা আছে? তপনের কাঁধ ধরে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল শ্যামলী–

– কেন অমন করছো? রাগ করেছো আমার উপর? কেন? আমি কী দোষ করেছি? তা বলবে তো? মুখ না ফিরিয়েই তপন বলল শুধু–

– এখান থেকে তুমি যাও।

শ্যামলী প্রস্তরবৎ। বলল–

– না বললে যাবো না। তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার? বলে কেঁদে দিল শ্যামলী।

– তুমি যাবে এখান থেকে?

– না, যাবো না। বলো কী দোষ করেছি? বলো।

– কাল রাতে সবুজ তোমার ঘরে গিয়েছিল?

– হ্যাঁ, গিয়েছিল।

– কেন গিয়েছিল?

– তা জানি নে, কী যেন খুঁজতে গিয়েছিল।

– অত রাতে একজন যুবতীর ঘরে একজন যুবক কী যে খুঁজতে যায়? কী খুঁজতে যায়?

– আমি কী করে বলবো, কী খুঁজতে গিয়েছিল? আর তখন অত রাতই বা হলো কখোন? সন্ধ্যার একটু পরপরই তো?

– সন্ধ্যার পর মানে? তখন সন্ধ্যা?

–সন্ধ্যাই তো, কেবল সন্ধ্যা হয়েছে।

– ক্যানো, রাত আড়াইটা/তিনটার দিকে তোমার ঘরে যায় নি সবুজ?

শ্যামলী আর থাকতে পারল না। বুঝতে পারল তপন ভুল বুঝেছে। হয়ত ভুল দেখেছে। তাই শ্যামলীকে সন্দেহ করেছে। বুক জুড়ে প্লাবন এলো। হাঁউমাউ করে কেঁদে দিল। বলল– অমন কথা তুমি ভাবতে পারলে? তুমি আমাকে এত নীচ... আর বলতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে তপনের বুকে পড়ল ঢলে। তপনের ভুল ভাঙল। সে ভাবল– তাই তো সবুজ তো অন্য কোথায়ও যেতে পার তো? শুধু শুধু শ্যামলীকে সন্দেহ করছে কেন সে? ওর কী দোষ? নিজের এ ধরনের হীনমন্যতার জন্য প্রচণ্ড লজ্জা ও কষ্ট লাগল তপনের। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শ্যামলীকে– আমাকে ভুল বুঝ না শ্যামলী, আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। আর কখনও এরকম ভাববো না।

তপনের বুকে প'ড়ে কিছুক্ষণ কাঁদল শ্যামলী। তপনও দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত। ভাবছে– সামান্য সন্দেহে কত বড় ভুল বোঝাবুঝি? দু'জনের ভেতর আর কোনো কথা নেই মুখে। আছে অনুভব। কথা আছে মনে। কী কথা, তা জানা যায় না। বাতাসে ফুলের গন্ধের মতো কথারা মিশে আছে বুকে। এমন নিভৃত মুহূর্ত আর আসে নি কখনও এর আগে। এমন অন্তরঙ্গভাবে আর মেশে

নি তারা কখনও। কেমন এক মদির নেশায় আচ্ছন্ন দু'জন। ভুলেই গিয়েছিল– এছাড়াও একটা জগৎ আছে বাইরে। দু'জনই তারা পৃথিবীর সব নয়। অথচ এ রকমই হয়। তখন তুমি আর আমি মিলেই পৃথিবী। আর কোনো প্রাণ নেই, প্রেম নেই। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে যেমন পানি; তেমনি তুমি আর আমি মিলেই জগৎ। যে কোনো একজন বিশ্লিষ্ট হলেই জগতের অস্তিত্ব লোপ পায়। এভাবে একান্তে থাকতে কোনো অবসাদও আসে না। অনন্তকাল যেন নিমেষমাত্র। পরম এক সুখের সমুদ্রে নিমজ্জিত তারা। যে সমুদ্র আগে কখনও দেখে নি। যে সমুদ্রে আগে কখনও ভাসে নি। এবার ঠোঁটও তাদের দূরত্ব হারাল।

রাগিণীর আলাপ যখন জমে ওঠে তখনই সরোদের তার ছেঁড়ে। সুন্দর গোলাপেই কাঁটা গজায়। নিরবিছিন্ন সুখের স্রোতে হঠাৎ এক টুকরো দুঃখের ঢিল পড়ে। আর কেঁপে ওঠে নিথর জলের মতো সুখ। সবুজ ফিরছে ধীরে। তপনকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন মঙ্গল। তাই পা টিপে টিপে আসছে। ঘরের কাছে। দেখে আন্ধকার। অথচ দরোজা খোলা। বুঝতে পারল না তপন আলো জ্বালে নি কেন। মনে কৌতূহল হলো। মানুষের মনের মতো টিনের ঘরেও অসংখ্য ছিদ্র থাকেই। আর সেই ছিদ্র পথে চোখ রেখে সবুজ দৃষ্টি চালিয়ে দিল ভেতরে। দু'টি দেহ মিশে আছে জড়াজড়ি করে তপনের বিছানায়। কী এক উল্লাসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিহরণ খেলে গেল তার সারা দেহে। মনে। হুররে হো, হুররে হো করে চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু করল না। দৌড়ে গেল পাশের ঘরে। ওরা দু'জন নভেল পড়ছিল। ঘরে ঢুকেই নভেল দু'টো ছো মেরে নিয়ে বন্ধ করে রেখে দিল টেবিলে। উপন্যাস কেবল জমছিল। এমন সময় ছন্দপতন? রাগে কিছু বলতে যাচ্ছিল তারা। সবুজ তাদের থামিয়ে চুপিচুপি বলল– এ পড়ে আর কী হবে ছাই; নভেল দেখো জমেছে ও ঘরে। চেতনারহিত হলো তাদের। বলে কী? পড়ি কি মরি করে ছুটে এলো দু'জনই। চোখ রাখল বিশ্বাসের ছিদ্রে। দেখল, তপনের অধিকারে লুকোচুরি খেলছে শ্যামলীর ঠোঁট। বেড়ার টিনে সুনির্দিষ্ট তিনটি টোকা মারে সবুজ টক্ টক্ টক্। তপন আর শ্যামলীর নৈঃশব্দের পৃথিবী আঁতকে ওঠে। একে অপরকে ছেড়ে দ্রুত উঠে বসে দু'জন। কী করবে তা বুঝে ওঠার আগেই তিনজন হাহা করে ঢুকে পড়ে ঘরে। আলো জ্বালে সবুজ। শ্যামলী পাংশুবর্ণ হয়ে যায়। তপন ম্লান। যেন জিরো পাওয়ারের ডিমলাইট। তিনজনে হাসির কোরাস ধরল– হা হা হা, হি হি হি, হো হো হো, হে হে হে। তপনের মাথায় আগুন জ্বলতে লাগল। শ্যামলীর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। ধীমান বলল– আমরা বুঝতে পারি নি, বিরক্ত করার জন্য ভাই দুঃখিত, চলি তাহলে?

সঞ্জয়– আলোটা নিভিয়ে দিই? পথ ভুলে ভাই এসেছিলাম আমড়াগাছের তলে, জ্বালিয়েছিলাম আলো–

আর সহ্য করতে পারল না তপন। ধমক দিয়ে উঠল–

থাম তোরা, কী পেয়েছিস? শ্যামলীকে আমি ভালোবাসি।

হো হো শব্দে হেসে উঠল সবাই– ভালোবাসি? ফষ্টিনষ্টি করে ধরা পড়ে এখন কাজের মেয়ে হয়েছে প্রেমিকা? লাভার? যন্ত্রণায় মুষড়ে গেল শ্যামলী। কুঁক্ড়ে এক ফোঁটা কালি হয়ে গেল। কোন্ পাপে তার এ হলো? নিজেকে তার নরকের জঘন্য অধিবাসী মনে হয়। অন্ধকারে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। অন্ধকারের আলিঙ্গনই যেন পরম বন্ধু এ মুহূর্তের। ওদিকে লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে কাঁপছে তপন। অনুতাপ আর আপমানে জ্বলছে। কী করে বুঝাবে তাদের, শ্যামলী সত্যি তার প্রেমিকা? ওরা ভাববে মিথ্যে কথা। কী এক দুঃসহ যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করে আছে! ওদিকে যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে বসে আছে অন্য তিনজন। তারা যেন ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। রাগে ভেতরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে তপনের। বলে উঠল– দ্যাখ, শ্যামলীকে তোরা কাজের মেয়ে বলবি না। আমি ওকে ভালোবাসতাম। আমার বাবা বিয়েতে মত দেয় নি বলে পালিয়ে এসেছি দু'জনে।

সবুজ– আগে তো একথা বলো নি বাছাধন? ডুবে ডুবে জল খাও, ধরা তুমি নাহি দাও। এখন বড়শিতে গেঁথে গিয়ে শ্যামলী আমার লাভার?

তপন– আগে বলি নি বলি নি; এখন তো বলছি?

ধীমান– তাহলে বাবা বিয়ে করো, ওই গান্ধর্ব পদ্ধতি চলবে না।

হেসে উঠল সবাই আবার।

সঞ্জয়– লাইসেন্স করে বৈধ করে নাও।

আবার হাসি। জমে বরফ হয়ে গেল শ্যামলী। আর ভেতরটা জ্বলতে লাগল তপনের।

নিঃসঙ্গতার অন্ধকার পথে

হেঁটে যাই স্বপ্নীল মানুষ
বাতি জ্বালি
জ্বলে শূন্যতারই শিখা–

জ্যৈষ্ঠের শুরু। দেশে যুদ্ধ। বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল-কলেজ। বেশ কিছুদিন ছুটি। সাধন যায় না কোথাও। বাড়িতে পড়েপড়ে দুপুরটা শুধু ঘুমায়। এমন এক দুপুরে গাছতলায় হোগলা বিছিয়ে শুয়েছে সাধন। উপরে ঝুলছে আম। যেন একটু শঙ্কাও জেগেছিল– ছিঁড়ে না পড়ে নাকের উপর? ভরসা হলো– এখনও তো বোঁটা কাঁচা, শক্ত; আর তাছাড়া এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে নাকের উপরইবা পড়বে কেন আম? ভাবতে ভাবতে বেশ একটু তন্দ্রা আসে। কাঁচা ঘুমের মধ্যে টের পায় নাকের মধ্যে কে যেন সুড়সুড়ি দেয়। স্বপ্নের ঘোরে দেখল একটা পাকা আম নাকের ভেতর ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। ঘুমটা ছুটে গেল। আস্তে আস্তে চোখ খুলল। নাকটা একটু কোঁচকালো, যা দেখল, তাতে তার ভীষণ কান্না পেল। মৃত্যুর কথা মনে পড়ল সাধনের। একটা ইয়ে বড় কাঁঠালে মাছি তার নাকে পড়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। আর শুঁড় দিয়ে পিন্‌পিন্ করে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সাধন যেন ভগ্নীপতি? সাধনের কান্না পেল। নিজেকে তার মৃত মনে হলো। মৃতের নাকে ছাড়া মাছি ঢোকে? মাছিতেও তাকে মৃত ভাবে? কান্নার সাথে সাথে প্রচণ্ড রাগও হলো তার। দড়াস্ করে কষিয়ে এক থাপ্পড় ঝেড়ে দিল নাকের উপরে। ভন্ করে উড়ে গেল মাছিটি। প্রচণ্ড ব্যথা পেল নাকে। মরে নি বলে মাছিটার উপর তার রাগ আরও বেড়ে গেল। তাই চুপ মেরে থাকল। বেশি রাগলে সাধন চুপ মেরে যায়।

এ সময় তার বউ সুরেশ্বরী এসে হাজির। চোখেমুখে কেমন একটা সহানুভূতির ছাপ। সমবেদনাময় মুখ। বলল– ঘুম ভাঙলো তোমার? বিন্দু দিদির জন্য আমার বড় কষ্ট অয়। একলা একলা ক্যামনে থাহে কেডা জানে? তারচে এক কাম করো না? বিন্দু দিদিরে আমাগো বাড়ি নিয়া আইসো না? যে কয়দিন বাঁচে, আমাগো সাথেই থাউক। স্বামীর শোকটা কাটাতে না কাটাতেই মেয়ের শোকটা নেমে এলো বিন্দুর উপর। এক শোক অন্য শোককে ঢেকে দেয় না। বরং বাড়িয়ে তোলে। হোমাগ্নিতে ঘি ঢালার মতো জ্বলে। বেশ কাবু হয়ে পড়েছে বিন্দু। ঘরে মোটেই মন বসে না। জমিতেও কোনো ফসল হয় নি। একটা মাত্র পেট। তবু অভাব লেগেই আছে জড়ুলের মতো। না। জোঁকের মতো। আর জোঁকে যেমন রক্ত চুষে খায় শরীরের, অভাবেও তেমনি শরীরের রক্ত চুষে খেয়ে কঙ্কাল সার করে ফেলেছে দেহ। শরীর শুকিয়ে গেছে। আগের সে শক্তি নেই, ঔজ্জ্বল্যও নেই। শোকে যেন তাকে শুষে ফেলেছে। দিনদিন নেতিয়ে পড়ছে সে। বেরুতেও পারে না বাড়ির বাইরে। সারাগ্রামে কেউ তাকে পছন্দ করে না। কুৎসা রটায়। গ্রামের মানুষ মানুষের কু গাইতে মজা পায়। কীসে অন্যের নিন্দে-মন্দ করা যায় তাতেই ব্যস্ত। শুধু সাধনদের সাথেই তার যা একটু মেলামেশা। তাই ফাঁক পেলেই এ বাড়ি ছুটে এসে দু'একটা সুখ-দুঃখের কথা বলে বিন্দু। বিন্দুর জন্য মনটা বড় তাই কাঁদে সুরেশ্বরীর। সাধন দেখল, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তাই একদিন গিয়ে বলে কয়ে তাদের বাড়ি নিয়ে এলো বিন্দুকে।

আগের থেকেই দু'বউয়ে বেশ ভাব। তাই বিন্দুও বিশেষ একটা আপত্তি করে নি। সব গুছিয়ে নিয়ে চলে এলো সাধনের বাড়ি। ভালোই কাটছিল তাদের দিন। শ্যামলীর কথাও মনে পড়েছে মাঝে মাঝে। দু'একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছে। বেশ হাসি-তামাশা-আনন্দ ফুর্তিতে কেটে গেল ক'টা মাস।

কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না সুখ। সুখের গায়েও কাঁটা গজায়। আর তাই সুখ রক্তাক্ত হয় দুঃখের স্রোতে। অন্তরঙ্গ দু'বন্ধুও এক জায়গা থাকলে কখনও-সখনও ভুল বোঝাবুঝি হয়। স্বামী-স্ত্রীতেও মনোমালিন্য হয়। তবে তারা একান্ত আপনজন বলেই মিলও শীঘ্রই হয়। বিন্দুর সাথে সুরেশ্বরীর এরকম একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি হতো প্রথম প্রথম। মিলেও যেত আবার। বিশেষ একটা গভীরে পৌঁছাত না ঝগড়া। কিন্তু দিন যতই গড়াচ্ছে, মনের ধুলোবালিগুলোও ধীরে ধীরে তত শুরু করছে জমতে। এরপর থেকে মাঝেমাঝেই বচসা হতো দু'বউয়ে। পরে ঝগড়া। একে অন্যের দোষ খুঁজতে খুঁজতে গভীরে চলে যেত। এক সময় সাপ বেরিয়ে পড়ত। ঈর্ষা কেউটের বাচ্চা। ফুটেই ফোঁস। হলোও তাই। এ ক'মাসেই দু'বউয়ে একে অন্যের চোখের বিষ। সুরেশ্বরী টিপ্পনী মেরে কোনো কথা বললেই বিন্দুর মনে হয় সে যেন এ বাড়ির দাসি, আশ্রিতা; তাই সুরেশ্বরী এ ধরনের বলে। বিন্দু কিছু বললে সুরেশ্বরীর মনে হয় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মাগির ঢং কত। ল্যাজ নাই কুলপানা চক্কর।

সব ব্যাপারেই উদাসীন সাধন। শুধু তার নিজের ব্যাপারেই অহেতুক সচেতন। ঝগড়া লাগলে থামানোর কোনো উদ্যোগ নেই। শুধু মনেমনে ভাবে– এই দুই বউ, তারাও তাকে মানুষ বলে গণ্য করে না। সে জলজ্যান্ত একটা মানুষ, পুরুষ মানুষ এবং জীবন্ত; অথচ তাকে কোনো তোয়াক্কাই করে না এরা? জড় মনে করে। তার প্রচণ্ড রাগ হলো। কার উপর তা জানে না। নিজের উপর। সে সব সময় রাগলেই নিজের উপর রাগে। রাগটাও তার প্রচণ্ড হয়। আর তাই আরও চুপ মেরে থাকে। রাগলে যেন সে বরফ হয়ে যায়, যে বরফ গলবে না কোনোদিন।

জীবন মানেই যন্ত্রণার

একতাল জীবন্ত মাংসপিণ্ড
ক্রমাগত যে আরও
যন্ত্রণার দিকেই ধায়।

এ তো গেল সাংসারিক ঝগড়া। কথায় বলে বিপদ যখন আসে, তখন ঝাঁক বরাদ্দে আসে। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল ভিন্ন উপসর্গ। বিন্দু গর্ভবতী। খবরটা প্রথমে টের পেলো সুরেশ্বরী। সে দেখল, যে বিন্দুর তলপেট ঢিবির মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। বুঝতে বাকি থাকল না তার, বিন্দু নিশ্চিত গর্ভবতী। এবং এও বুঝল, কাজটি তার গুণধর স্বামী হাবা গোবর্ধন সাধন, যিনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, তিনি ঘটিয়েছেন। রাগে ঈর্ষায় কেঁদে দিল সুরেশ্বরী। শেষে কিনা এই হলো? নিজেই নিজের বাড়িতে খাল কেটে কুমির এনেছে। বিশ্বাসের পায়ে কুড়াল মেরেছে বিন্দু। বেশ্যা মাগিকে বাড়িতে জায়গা দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বামীকে হারাল। সব মনে পড়ছে তার এখন– সাধন তার দিকে সোহাগের দৃষ্টিতে তাকায় না আর। হেসে কথা বলে না। রাতে শুলেই পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শোয়। বিন্দুর সাথে হেসে রসের কথা কয়। যতই তার মনে পড়তে লাগল এসব, স্বামীর উপর তার রাগ চড়ে যেতে লাগল ততই। আসুক বাড়িতে। এলেই হয়ে যাবে এক পশলা।

ইতোমধ্যে বিন্দুকে ডেকে খবরটি জানিয়ে দিল সুরেশ্বরী। বিন্দু আঁৎকে উঠল। মনে হয়, হাইড্রেপিচ্ বেলচেরার মতো বিষাক্ত সাপ তাকে পেঁচিয়ে ছোবল মারার জন্য ফণা তুলেছে মুখের সামনে। সে গর্ভবতী? কী করে? এ তো সে কখনওই খেয়াল করে নি? দ্রুত চোখ চলে গেল নিজের তলপেটে। সত্যি তো? উঁচু কেন? মনের অজান্তেই হাতটা চলে গেল নিজের তলপেটে। সত্যিই অস্বাভাবিক রকম উঁচু। এ কী করে হলো? কিছুতেই তার মাথায় খেলছে না। সে তো মনে মনেও কোনো অন্য পুরুষকে কামনা করে নি। তাহলে এ হলো কী করে? তবে কী? ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল মন। লজ্জায় মিশে গেল মাটির সাথে। সুরেশ্বরীও ঘরে গিয়ে ঢুকল পেছন পেছন। মুখে ঝামটা মেরে বলল–

আঃ মাগির আমার কী যে দুঃখু? গতর খাগি মাগি, আগে খেয়াল করে নাই, এহোন কাইন্দা বুক ভাসায়? নষ্টা, ছেনাল মাগি, আমার স্বামীডারে খাইছে? প্যাটে প্যাটে এত বুদ্ধি?

বিন্দু কোনো উত্তর দিল না। শুধু কাঁদতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এতদিন লোকে যা বলছে, বলেছে; এখন সে কী করবে? সবাই তার পর। এই একটা মাত্র পরিবারই তার আশ্রয় ছিল। তা-ও আজ পর হয়ে গেল। মাথা গোঁজার সর্বশেষ আশ্রয়ও চলে গেল। পায়ের নিচের শেষ মাটিটুকুও তার ভেসে গেল। ডুবে গেল। সরে গেল। এবার সে ভাসমান শ্যাওলা। স্রোতের খড়কুটো। এরপর সে মুখই বা দেখাবে কী করে? কী দোষে তার এ হলো? বিন্দুর বেগবান কান্না তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল অজানা কোথাও।

সন্ধে হয় হয়। এখনই সাধন আসবে। তাই মুখ ধার দিয়ে তৈরি হয়ে থাকল সুরেশ্বরী। কিন্তু সাধন আসে না। প্রতীক্ষার সময় যেন পাথর। ক্ষয় নেই তার। মাঝেমাঝেই তাকাচ্ছে পথের দিকে। এলো না। আর রাগটাও তাই একদম তুঙ্গে উঠে থাকল। কারও সাথে ঝগড়া করার জন্য আগে থেকেই কেউ যদি প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি যদি আসতে দেরি করে, তবে আসতে যত দেরি হয়, রাগও তত বেড়ে যায়। আর সে ব্যক্তিটি এসেও যদি ঝগড়ার মুখে পাল্টা ঝগড়া না করে চুপ মেরে থাকে, তাহলে রাগান্বিত ব্যক্তির রাগ যায় আরও শতগুণ বেড়ে।

স্কুলের মাঠে জনতার এক সভা থাকায় ফিরতে বেশ রাত হলো সাধনের। সারাদেশে আগুন জ্বলছে। নেতৃবৃন্দ এসেছিল শহর থেকে। তারা জানাল সারাদেশের পরিস্থিতির কথা। বিভিন্ন জায়গায় কী ঘটেছে। সাধনের ইচ্ছে হলো– সেও একটা রাইফেল কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যায়। মনেমনে বেশ বীরবীর লাগল নিজেকে। ভাবল– প্রথমেই সে ইঁদুর মারবে। ইঁদুরই যত শয়তান। ঘরের ইঁদুরে বাঁধ না কাটলে কি ঘর ভাঙে? তারপর এক এক করে সে কুকুর ও বিড়ালগুলোকে গুলি করে মারবে। এ সব ভাবতে ভাবতে সাধন বাড়ি ফিরল। মাথাভর্তি রাগ। ক্ষিধেটাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বেশ। তাই বাড়িতে এসেই বলল–

– কইরে, ভাত দেও শিগগির; প্যাটের মধ্যে ক্ষিধায় চোঁচোঁ করছে। সাধনের সাড়া পেয়ে সুরেশ্বরী ঝামটা মেরে উঠল–

– আইসো, ভাত না ছাই দেবো মুখে? এমনি দেহি ভিজা বিড়াল, ভাজা মাছখানা উল্টাইয়া খাইতে পারে না। তা তলে তলে এতো? ওস্তাদের শিরোমণি শিবঠাকুরের গুরুমণি। ফষ্টিনষ্টির গুরুগোঁসাই।

আকাশ থেকে পড়ল সাধন। 'এ কী কথা শোনে সে আজ মন্থরার মুখে'? কিছুই বুঝতে পারল না। বলল–

– কী কস্? ফষ্টিনষ্টি মানে?

– আ হা হা, কচি খোকা আমার, কিছুই বোঝে না? নাকে টিপ দিলে দুধ বাইর অয়?

– সাবধান, অশ্লীল কথা কবি না?

সুরেশ্বরী এক হাতে সাধনের এক হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো বিন্দুর কাছে। অন্য হাতে কেরোসিন তেলের বাতি। গিয়েই সাধনকে ছেড়ে দিয়ে ঝম্ করে টান মেরে শাড়িটি খুলে বিন্দুকে দিল উদোম করে। তলপেটের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল– ঐ দ্যাখো? দ্যাখছো? বলে ফষ্টিনষ্টি মানে? কিছুই জানো না, তাই না? ও কামটি কার? শনি ঠাকুরের চ্যালা?

তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বিন্দু। সে তার লজ্জা ঢাকার জন্য দ্রুত উপুড় হয়ে পড়ল বিছানায়। এত দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা যে সাধনের মাথায় ঢুকল না। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। এ কী হলো? সে কী দেখল? তার বউই বা তার সামনে বিন্দুকে একদম উদোম করে দিল কেন? অন্যের বউ? পর নারী? এ সব চিন্তা এক সাথে তার মাথার ভেতর ঢুকে জটলা পাকাল। তার সমস্ত বোধ নষ্ট করে দিল। একখণ্ড পাথর হয়ে গেল সাধন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকল স্ট্যাচুর মতো। এ যেন ভি.সি.পি'র ছবি। ফ্রিজে আছে। রিমোট অন্যের হাতে। প্লে তে চাপ পড়লেই সচল হবে। হলোও তাই। রিমোট ছিল সুরেশ্বরীর মুখে। কাঁসরের ঘণ্টার মতো যখন ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে আবার ঝামটা মেরে বেজে উঠল সুরেশ্বরীর মুখ। তখনই সংবিৎ ফিরে পেল সে। সবাক চলচ্চিত্রের মতো উঠল নড়ে এবং কথা বলে–

– 'সর্বনাশ'!

শুধু ওই একটা মাত্রই শব্দ। তারপরই অন্যকিছু চিন্তা। ভাবতে শুরু করল আবার– এই দু'টি স্ত্রীলোক কি তাকে বিড়াল-কুকুর মনে করে? অথবা তার চেয়ে অধম কিছুই? সে জীবন্ত একটা মানুষ এবং পুরুষ, তার সামনে গর্ভবতী নারী উলঙ্গ করে দিল? এটা খারাপ। কোনো গর্ভবতী নারীকেই কোনো পুরুষের সামনে উলঙ্গ করা ঠিক নয়। এতে পুরুষটিকে অপমান করা হয়। নারীটাকেও। গর্ভবতী বিন্দুকে এভাবে তার সামনে... হঠাৎ তার মনে হলো গর্ভবতী মানে? গর্ভবতী? বিন্দু গর্ভবতী? গর্ভবতী হলো কী করে? হতচ্ছাড়া কাণ্ড। উদোম করার চেয়েও বেশি খারাপ। অশ্লীল বিষয়? বিন্দুরই বা কী আক্কেল? আমার বাড়িতে থেকে? দূর করে দেবো সব, দূর করে দেবো। পরক্ষণেই ভাবে– তাহলে তো আরও জানাজানি হয়ে যাবে? আবার ভাবে– জানাজানি হলেই বা কী? সে কি ইয়ে করেছে যে...? মুহূর্তে চিন্তা বদল হয়– বিশ্বাসই বা করবে কে সে কথা? বরং চুপচাপই থাকুক। ছাইয়ে বাতাস দিলেই উড়বে।

কিন্তু ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাটলে তো তা আর দিয়ে রাখা যায় না। তাই হলো। সুরেশ্বরী নিজেই দশকানে বয়ে বয়ে খবরটি দিয়ে আসতে লাগল। এ খবরটি এখন দু'রকম রঙে রঙিন হলো। এক. সাধুরই কাণ্ড। অমুকে অমুকে বিন্দুকে দেখেছে জগাইর আশ্রমে যেতে। দুই. সাধনেরই কাণ্ড। পাশাপাশি মোম আর আগুন থাকলে মোম তো গলবেই। দেখলে হবে কি সাধু গোছের, আসলে ওটি একটি ভেজা বেড়াল? তাছাড়া মাগিটাও কি কম? স্বামী খাগি, গতরখাগি মাগি। মাইডাও তো... ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুর্গন্ধ বাতাসে বেশি ছড়ায়। দুর্নাম আরও বেশি। যা ঘটে, তারও বেশি রটে। এবং বারুদে আগুন লাগার মতো দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল খবর মুখরোচক হয়ে মুখে মুখে ফেরে। দু'চারজন বিন্দুকে দেখতে আসতে লাগল। বিন্দু আর ঘরের বের হয় না। সুরেশ্বরী তার স্বামীকে দোষ দেয়। আর সাধন প্রচণ্ড রাগে চুপ মেরে যায়। সাধন প্রতিবাদ করে না বলে সুরেশ্বরীর সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হয় এবং অটল বিশ্বাসে রূপ নেয়। সাধন ভাবে কাণ্ডটা কী হলো? মানুষের সামনে যেতে তার লজ্জা লাগে না। তাপসী ভাবে– বিন্দু মাসির প্রতি মা এত খ্যাপলো ক্যান? গর্ভবতী হওয়া মেয়েলোকদের কী এমন দোষের? তার মা ও তো গর্ভবতী হয়েছিল? মনে আছে তার– ছোট ভাই তখন তার মায়ের প্যাটে।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই

নিভে যায় বারে বারে।

নিজস্ব কোনো সাগরেদ নেই জগাইর, সে ভাবে। তার বিশ্বাস– জগতে সবাই একা। কে কার? কা তব কান্তা? সাগরেদ? সেও তো পর? স্ত্রী-পুত্র, সবই পর। নশ্বর জীবন। ওই তো শ্মশান দেখা যায়? তবুও দু'তিনটে সাগরেদ আছে জগাইর। এরা মোটে লেজ ছাড়ে না। গাঁজার শিষ্য। প্রতি রাতেই প্রায় এসে তারা আসর পাতায়। গাঁজায় টান মারলেই জগাইর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। আর সাগরেদদের দিব্যদৃষ্টির ফুঁটো বন্ধ হয়ে যায়। অথবা ছিদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যায়। গাঁজায় টান মেরে তাই জগাই জ্ঞানগর্ভ দু'চারটে বুলি ঝাড়ে আর সাগরেদদের বন্ধজ্ঞানের কাছে জগাই মহাপ্রভু হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে জগাই একধারচে আবোল-তাবোল বকে যেতে থাকে।

বিন্দুর গর্ভবতী হবার খবর আবিষ্কারের তিন দিন এক রাতে, এ রকম এক গাঁজার আসর বসে জগাইর আখড়ায়। সাগরেদরা জগাইকে বাবাজি বলে। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংযতভাবে কথা বলে। কিন্তু গাঁজার নেশা যখন চড়ে যায় তখন জগতের জঘন্যতম ভাষার চর্চা করতে ভোলে না। জগাই তখন শালা থেকে শুয়োরের বাচ্চা হয়ে যায়। জগাই তাতে খুশিই হয়। সেদিনও নেশা সবে জমে উঠেছে। ধনঞ্জয় বলে উঠল– বাবাজি, আপনার কিরিপা বড় অসীম, বড় উচ্চাঙ্গের নীলাখেলা। কুমারী মাতা মেরির গর্ভে যেমন যিশু জন্মেছিল, এবার বেধবা মাতা বিন্দুর গর্ভেও কিছু জন্মিবে। বলিহারি আপনার খেলা? সচেতন হয়ে উঠে জগাই– ভাবে, ধনা কয় কী? শালা মনে হয় তারে ইঙ্গিত করে?

মুখে বলল– কী কস্ ধনা? কার কী অইছে? সাগরেদদের সাথে মিশলে জগাইর ভাষা লাগামহীন হয়ে পড়ে। বিন্দু আর জগাইকে নিয়ে আগেও যে দু'পাঁচ কথা উঠেছিল এবং তার ছিঁটেফোঁটা যে জগাইর কানেও আসে নি, এমন নয়। জগাই তাই চমকে উঠল, ধনঞ্জয় বলল–

ঝাড়ুগোপালের বউ সতী মাগি বিন্দু গর্ভবতী। হগলেই কয় জগাই গোসাইর কাম।

পাশের থেকে মৃত্যুঞ্জয় বলে উঠল– গোঁসাই, পেঁস্যাৎ যেন পাঁই।

অমনি হো হো করে হেসে উঠল সবাই। তাড়াতাড়ি চড়চড় করে গাঁজায় দীর্ঘ এক টান দিয়ে দম মেরে বসে থাকল জগাই। বুদ্ধি বের করতে হবে। নয়তো গ্রামের মাইনসে পিটিয়ে তার পাছার তেল খসিয়ে ছাড়বে। খবরটা যদি সত্যিই হয় তাহলে তো পোন্দে বাঁশ হাতে হ্যারিকেন।

কিন্তু সহসা কোনো বুদ্ধি এলো না মাথায়। এভাবে কাটল কিছুক্ষণ। গাঁজার শুকনো বিষে ইতোমধ্যে নেতিয়ে পড়েছে সাগরেদ দু'জন। ঢলে পড়ার সাথে সাথে শুরু হয়েছে নাকডাকা। যেন হুলার হাটের লঞ্চ। জড়াজড়ি করে পড়ে আছে দু'জন। মনে হচ্ছে যেন একে অপরের কোলবালিশ। বসে বসে একের পর এক গাঁজায় দম দিয়ে যাচ্ছে জগাই। আর ভাবছে। জট কিছুতেই ছুটছে না মাথার। ভাবছে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই আর। কিন্তু ওঠার শক্তি নেই তার। চোখ দু'টো ঢুলুঢুলু। কড়ুকড়ু করে দ্বিতীয়বার ডেকে উঠল বাজপাখি। চমকে উঠল জগাই। আবার ঝিমুনি আসছে। তবু জট খুলছে না। দরোজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দরোজাটা মনে হচ্ছে কত দূর! মনে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে। ঘরের চেয়ে বাইরে অন্ধকার কম। ঘরে কোনো বাতি নেই। বাইরে তারার আলো। জোনাকির আলো। ফুস্ করে জ্বলছে আর নিভছে। খুব মজা লাগছে জগাইর। মনে হয় ঘরটা তার মন। আর বাইরেটা বাইরে। একটু একটু দিব্যদৃষ্টি খুলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। জগাই ভাবছে– মানুষের মন জোনাকি পোকার মতোই। ফুস্ করে জ্বলে আর টুপ্ করে নেভে। মাইনসে বলে– মানুষ মারা গেলে নাকি তার চোখ জোনাকি পোকা হয়ে যায়। কিন্তু জগাইর বিশ্বাস ভিন্ন। তার ধারণা মানুষ মরার পর তার মনটা জোনাকি পোকা হয়ে যায়। আর আদাড়-বাদারে শুধু ফুসুৎ ফুসুৎ জ্বলে আর নেভে। একটা জিনিস জগাই খেয়াল করেছে– বাইরে এত জোনাকি, অথচ একটাও তার ঘরে ঢোকে না। জগাই ভাবছে– তার ঘর মানে তো তার দেহঘর। সে জায়গায় তো একটা মন আছেই? সেখানে আর জোনাকি ঢুকবে কী করে? আসলে তো তার মনটা অন্ধকার? মনের জোনাকিতেই তো তারে খেলো? এসব ভাবতে ভাবতে জগাই দেখতে পায় তার দরোজার সামনে এক নারীমূর্তি। জগাই ভাবছে– এ তার মনের ভুল। মনের জোনাকি পোকায় দেখে। আসলে ও কেউ না। তাই মাথা ঝাঁকা দিয়ে, চোখ দুটো দ্রুত কয়েকবার খোলা বন্ধ করা, খোলা-বন্ধ করা করে আবার তাকিয়ে দেখল– নারীমূর্তি স্থির। এবং মনে হয় উলঙ্গ। ভেতরটা জগাইর তিরিক করে উঠল। দ্রুত চোখ বন্ধ করে ফেলল আবার। অস্ফুটে হর হর ব্যোম ব্যোম বলল কয়েকবার মুখে। আবার চোখ খুলল। না। নির্ঘাৎ নারীমূর্তি। দু'তিনটা জোনাকি নারীমূর্তির সামনে জ্বলে উঠতেই জগাইর দাম ফটাস। এই অন্ধকারের মধ্যে ওই জোনাকির আলোয় নারীকে এমন দেখায়? কী আপরূপ! কী মোহনীয়। আগে কখনও দেখে নি জগাই। আরও কয়েকবার জ্বলল, নিভল জোনাকি। জগাই আরও বিস্মিত হল। এ কী! এ যে বিন্দু। আগেরবারে এটুকুও দেখে নি সে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল। কিন্তু এবারে সে তো এ দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না? তাহলে কি কোনো কিছু পাওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকলেই তাই হাতে এসে ধরা দেয়? 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে।' আবার ভাবছে– দুর, এসব কী দেখছি? এ তো নেশার ঘোর? ঘোর কাটলেই সব ঠিক। তখোন ন্যাংটো বিন্দু ফক্কা কিন্তু এ কী! মূর্তি দেখি সচল হয়? ধীর পায়ে জগাইর দিকে সত্যি সত্যি এগিয়ে গেল মূর্তি। চমকিত হলো জগাই। ঠিকঠাক হয়ে বসে চোখ বুঁজে হর হর ব্যোম ব্যোম করতে লাগল। জগাইর সামনে এসে মূর্তিটি হাঁটু গেড়ে বসল মুখোমুখি।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবিৎ।

জীবনের জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছে বিন্দু। ঘূর্ণির আবর্তে ঘুরছে ঘোরের গোলক ধাঁধায়। দেখল, তাকে নিয়ে যেভাবে কানাঘুষা শুরু হয়েছে গ্রামে, তাতে তার পক্ষে বের হওয়া কষ্টকর। এভাবেইবা কতদিন বাঁচতে পারে একজন মানুষ? নিজের গর্ভ ব্যাপারে সে নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। বুঝতেই পারছে না কী ভাবে কী হলো। জগাই ও সাধনকে জড়িয়ে তার নামে কুৎসা রটেছে গ্রামে। সে বুঝতেই পারছে না, জগাই বা সাধন কীভাবে তার গা স্পর্শ করল। সারাক্ষণ শুধু এই ভাবে আর কাঁদে। কার কাছেইবা একটু পরামর্শ পাবে সে এ সময়? আজকাল একেবারে থ' মেরে থাকে সাধন। কারও সাথে কথা বলে না। এক তাপসী যা একটু আসে তার কাছে। দু'একমুঠো খাবার এনে দেয়। এবাড়ির খাবারও এখন আর রোচে না তার মুখে। জ্বরগ্রস্থ রুগীর পথ্যের মতো লাগে। অনাদরের খাদ্য কি যেতে চায় পেটে? কথা না বলেই বা ক'দিন বাঁচতে পারে মানুষ? সে বুঝতে পারে না– আসলেই কি সে মা হতে চলেছে? যদি তাই হয়, তবে কি নষ্ট করে ফেলবে? কী ভাবে তা সম্ভব? আর যদি নষ্ট না করে? ইত্যাদি আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে তার খেয়াল হলো আশ্রমের বাবাজির কথা। বাবাজি যদি এর একটা বিহিত করতে পারে? একবার গেছিল তার স্বামীর অসুখ হলে। কী ভস্মপরা দিয়েছিল। তাতে কাজ হয় নি। স্বামী তাঁর বাঁচে নি। এ সমস্ত ব্যাপারে একনিষ্ঠ বিশ্বাস থাকা দরকার। কথায় বলে– বিশ্বাসে বস্তু মেলে, তর্কে বহুদূর। তখন সে সাধুবাবাকে সন্দেহ করে মনে মনে ঘৃণা করেছিল। সে জন্যই হয়ত কাজ হয় নি। এবারে সাধুবাবার কাছে আবার গিয়ে দেখা যাক, কী বলেন। এ সকল ভাবনা বিন্দুকে খোঁচায়। রাত যখন গভীর। সবাই যখন ঘুমে। নিঝ্ঝুম গ্রাম। পাথরের মতো রাত। এ সময় পা টিপে টিপে বিন্দু চলছে আখড়ার দিকে। যেন অভিসার। ঢিব্ ঢিব্ করছে বুক। না জানি কেউ দেখে ফেলে। ধীর পায়ে পৌঁছে গেল আখড়ার কাছে। মনে সংশয়, না জানি আবার কেউ দেখে ফেলে। এদিক-ওদিক তাই সন্দিগ্ধ উঁকি মারে। কিন্তু গোপন সব সময় উন্মুখ থাকে প্রকাশের জন্য। সে যেন খাঁচায় বদ্ধ এক বনের পাখি। ছাড়া পেলেই উড়াল মারে ভোঁ। তাছাড়া অন্ধকারে পথ চলতে গেলে অনেক জায়গা থাকতেও বেছে বেছে খানাখন্দেই পা পড়ে। এত কিছু বিন্দুর জানা নেই। জীবনের এই সব জটিল অধ্যায়ের পাঠ তার পড়া হয় নি। তাই ধীরে ধীরে আখড়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ মনে পড়ল বাবাজির কথা– কোনো বস্ত্র থাকতে পারবে না গায়ে, আসতে হবে জন্মদিনের পোষাকে। উলঙ্গ। জন্মদিনের মন নিয়ে। স্নান করে পুতঃপবিত্র হয়ে; না মোছা গায়ে। তাই কাপড় দরোজার এক পাশে খুলে রেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুকুর থেকে পরপর তিনটা ডুব দিয়ে এসে দাঁড়াল জগাইর ঘরের দরোজায়। ভাবে তখন মজে আছে জগাই। সামনে এসে তার হাঁটু গেড়ে বসল। খুলে বলল– মনের সব কথা। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো গভীর আর্তি। যে ভাবেই হোক উদ্ধার তাকে করতেই হবে। জগাইর তো 'কম্ব আডাস'। ঢিব্ ঢিব্ করছে তার বুক। এত রাতে এই মাগি এসে তার কাছেই মরেছে? যদি দেখে ফেলে কেউ? ও দিকে চোখ বুঁজেই সামনে দেখতে পাচ্ছে বিন্দুকে।
তিরিক করে উঠল ভেতরটা। একবার ভাবল– ধরবে নাকি জড়িয়ে। মুহূর্তে মনে পড়ল, পাশেই দুই কুম্ভকর্ণ শোয়া। যদি দেখে ফেলে? মনের এ দোটানার মধ্যে পড়ে গেল জগাই। এই-ই হয় তার। এক মন একটা ইচ্ছে করলে, অন্য মন ভিন্ন গায়। মন যেন ঘড়ির পেন্ডুলাম। কেন, স্থির থাকতে পারে না? তখনই তার জোনাকির কথা পড়ে গেল মনে। শালা ফসাৎ ফসাৎ জ্বলে-নেভে। এ মনটাও তেমনি। একবার ভাবে– ধরি জড়িয়ে। কিন্তু, যখনই তা ভাবে তখনই আবার অন্য মন ভাবে– না, কাজটা ঠিক নয়। কিন্তু মানুষের মনে এমনও জটিলতা কুটিলতা আছে যে, সবসময় ঠিক কাজটি মনে স্থান পায় না। কখনও সখনও উদ্দীপনার জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে মনটা এবং দুর্বল দিকটাই হয় জয়ী। সাদা জামার উপর এক ফোঁটা জলের চেয়ে এক ফোঁটা কালির প্রভাব বেশি। তাই কিছু না বুঝেই, না বলেই মানুষখেকো বাঘের মতো বিন্দুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জগাই। ধরল জড়িয়ে। এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হকচকিয়ে গেল বিন্দু। ধাক্কা সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। বিন্দুকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষতে লাগল জগাই। সচেতন হয়ে উঠল বিন্দু। কিন্তু আগের সে জোর নেই শরীরে। তাই ছাড়াতে পারছিল না। ধস্তাধস্তির শব্দে এবং বিন্দুর তিরস্কারে ধনঞ্জয়ের ঘুমটা গেল ভেঙে। আর মৃত্যুঞ্জয়ের ঘুমটা ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে থেমে থাকল। সে দেখল, শিবের ধ্যান ভাঙাতে পার্বতী এসেছে। কিন্তু ভাঙাতে পারছে না। তাই নিজের দেহে রতিকে ধারণ করে পার্বতী কামের দেবতা মদনকে দিয়ে শিবের গায়ে পুষ্পশর নিক্ষেপ করেছে। আর তাতেই বেঁধেছে যত গণ্ডগোল। শিব গেছে চটে। পার্বতী আকুলি-বিকুলি করছে। আর ধনঞ্জয় দেখছে– শিব আর পার্বতী ভাবের খেলায় মত্ত। সে বলল–
– 'যা বাওয়া, এ দিকি কার্তিক ভাব লেগেছে।'
জগাই দেখল– শালা সর্বনাশ তো? ছেড়ে দিয়ে বলল– হর হর ব্যোম ব্যোম, জয় মা তারা কুলকুণ্ডলিনাশিনী, যা চলে বাড়ি, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে এবার। বিন্দুকে চিনতে ধনঞ্জয়ের কোনো ভুল হলো না যাবার সময়। যদিও নেশার ঘোর তার কাটে নি তখনও পুরো, তবুও স্পষ্ট দেখতে পেয়ে সে আঁৎকে উঠল। বলে উঠল–
– 'একবারে ডবল ডোজ? এবারে কোন্ মোয়াপুরুষের জন্ম অবে?

বিন্দুর কানে এ কথা যেতেই কান চাপা দিয়ে সে দৌড়ে বেরুল ঘর থেকে। কাপড়টা কোনোভাবে জড়িয়ে সে সরে পড়ল। জানতোই না সে যে, এখানে আরও কেউ আছে। এ সময় কড়ুকড়ু শব্দে রাত্রি তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করল বাজপাখি। জগাই এক ধমক দিল–

– চুপ শালা, সাধনতন্ত্রের তুই কী বুঝিস?

ধনঞ্জয় চুপ মেরে গেল। কিন্তু সাধনতন্ত্রের সে যা বুঝুক, মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল– বিন্দুর পেটে যে বাচ্ছা, তার বাপ জগাই। ব্যস্, এ পর্যন্তই। এরপর দু'জনেই কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ধনঞ্জয়ের নাক ডাকা শুরু হলো। কিন্তু জগাইর আর ঘুম এলো না। হলো কী? এ কী করল সে? নিজের প্রতি নিজের প্রচণ্ড ঘৃণা গজাল। এখন উপায়? সিদ্ধান্ত নেয়– পালাতে হবে। এক্ষুণি তাকে পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। এছাড়া কোনো পথ খোলা নেই সামনে।

দিবস যদি সাঙ্গ হলো, না যদি গাহে পাখি

ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে।
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি।
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে।।

যখন মুখ লুকোবার কোনো জায়গা পায় না মানুষ, তখনই পালাতে চায়। পালাতে চায় জগৎ এবং জীবন থেকে। এ চিরচেনা পৃথিবী থেকে। পরিচিত জগৎ থেকে। যেন অচেনা জায়গাই তার জন্য উত্তম স্থান। কিন্তু, জানে না সে মানুষের কাছ থেকে পালাতে পারে না মানুষ। পৃথিবীর যেখানেই যাক, পালানোর কোনো জায়গা নেই তার। অন্ততঃ নিজের কাছে সে পড়েই আছে ধরা। তার 'আমি' তো তাকে অহরহ অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে– 'তুমি' পলাতক।' আর তাই পালানোর কোনো জায়গা নেই পৃথিবীতে। গাঢ় অন্ধকারে মুখ লুকাতে চায় মানুষ। কিন্তু, ভেতরের সামন্য আলোতে সে বিশাল অন্ধকার ধরা পড়ে যায়। ফুটে ওঠে আপন বীভৎস চেহারা। তাই পালানোর পথ নেই। একটিই জায়গা আছে পালানোর। সে হলো-মৃত্যু। কিন্তু আত্মহত্যা কাপুরুষরাই করে।

জগাইও তাই পালানোর পথ খোঁজে। তৎক্ষণাৎ তার আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। এই-ই উত্তম সময়। এটাই একমাত্র পথ। চলে যাবে দূরে। বহুদূরে। ফিরবে না কোনোদিন আর।

বিন্দুকেও আর পাওয়া গেল না পরদিন সকালে।

শেষের মধ্যে অশেষ আছে

এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।

বিন্দু নেই ভাবতেই সাধনের মনটা যেন কেমন তেতো হয়ে গেল। জ্বরগ্রস্ত রোগীর কাছে যেমন বিস্বাদ লাগে তরকারি অথবা কুলেখাড়ার রস, জীবনটাও সাধনের কাছে সে রকম লাগছে। জীবনটা যেন নিমের পাচন। বিন্দু চলে গেল? না গেলেই কি হতো না? কী-ই অসুবিধা ছিল? গর্ভ তো মানুষেরই হয়? মেয়ে মানুষের। এতে দোষের কী? হঠাৎ মন পড়ল– না, স্বামীহীন গর্ভ তো খারাপ? এ কাজ বিন্দুর খারাপ। অশ্লীল কাজ কার সাথে ঘটালো? বউ বলেছে– এ কাজ সাধনের। তা বলুক, সাধন তো জানে, এ কথা সত্য না। সবাই বলে চাঁদের গায়ে কলঙ্ক। চাঁদ তো জানে– ও তার কলঙ্ক নয়; ও হলো তার গায়ের খানা-খন্দ; পাহাড়-পর্বত? মানুষে বলুক তাতে চাঁদের কী? কিন্তু, বিন্দু যে গর্ভবতী, তা তো সে নিজেই দেখেছে। ভুল দেখে নি তো? চোখ দু'টো একটু রগড়িয়ে আবার তাকাল। যেন বিন্দু তার সামনেই। না, ভুল না। নিজের চোখকে সে কী ভাবে অস্বীকার করবে? তবে কার কাজ? জগাইর? হতে পারে কিন্তু বিন্দুকে সে যতটুকু জানে তাতে তাকে অবিশ্বাস করা যায় না। কখনও কোনো দোষ চোখে পড়ে নি তার চরিত্রে। আবার ভাবে, সব দোষই কি ধরা পড়ে? মানুষের বাইরের রূপটাই দেখা যায়। ভেতরটা তো দুর্গম পাতালপুরী। কার কতটা পাপের বীজ লুকিয়ে আছে ভেতরে, মাটির নিচের অন্ধকার খোলসে, কী করে দেখবে? কত পাপ-ই তো আলোর মুখ দেখে না। কখনও, চিরকালই গোপন থেকে যায় অন্ধকারে। কোনো সাক্ষী নেই যার। তারপরও শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না সাধন। বিন্দু যে গর্ভবতী তা বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই। অথচ নিজের চোখকেও যাচ্ছে না অবিশ্বাস করা। হঠাৎ তার মনে হলো– চোখের দেখাই কি সব? ফ্যান যখন ঘোরে, একটা চাকতির মতো দেখায় অথবা চরকির মতো অনেক পাখা। শহরে দেখেছে। বন্ধ অবস্থায় মাত্র তিনটি পাখা। তাহলে? কোন্‌টি ঠিক? আমরা যা দেখি তার অনেকই ভুল। চোখের ভুল। কোনোটা যা আছে তার বেশি দেখি। কোনোটা যা আছে তার কম দেখি। মরুভূমির বালুতে চিক্ চিক্ করে রোদ। তৃষ্ণার্ত পথিক ভাবে ও বুঝি নদী কিংবা সাগর। ছুটে যায়। বালু আর বালু। অতএব, চোখের দেখাই সব সত্য নয়। যাদুকর যা দেখায় তা কি সত্য? আলোর খেলা। বস্তুটি আছে। আলো না পড়লে দেখা যাবে না। আবার বস্তুটি নেই অথচ আলো দিয়ে দেখা যাবে। সিনেমার মতো। তাই চোখের দেখাই একমাত্র দেখা নয়। এই সেদিন এক ভিক্ষুককে দেখল সাধন টেকেরহাটে। বিরাট একটা কুমড়ার মতো কী যেন নিয়ে বসে আছে সামনে? ভিক্ষা করছে। দশ/বারো কেজি ওজনের পাথরের চাইয়ের মতো এক অণ্ডকোষ। কাছে গিয়ে সে অবাক। টিউমার! সে যা ভাবছে তা নয়। তাহলে? টিউমার তো মানুষের যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে? পেটেও। সাধনের মাথায় এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল– ইউরেকা, ইউরেকা। বিজ্ঞানের ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষকের মুখে এ শব্দ শুনেছে সাধন। নতুন আবিষ্কারের উল্লাসে আর্কিমিডিস বলেছিলেন এ কথা। কিন্তু সুরেশ্বরী বা তাপসী বা বাতাসি কেউই পরিচিত নয় এ শব্দের সাথে। তাই ছুটে এলো তারা। বিজ্ঞের মতো সাধন বলল–

যত অর্বাচীনের দল, অজ্ঞ, মুর্খের দল তোমরা, সামান্য কারণে কুরুক্ষেত্র বাঁধালে। একটুখানি ভুলের তরে অনেক বিপদ ঘটে– পড়েছো? পড় নি? মস্ত ভুল করেছো তোমরা...।'

বাঁধা দিল সুরেশ্বরী– অত আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম করা লাগবে না। ব্যাপারডা কী তাই কও? কী য্যানো কইলা?

পাশেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাপসী। সাধন বলল–

বিষয়টা পরিষ্কার, বিন্দু ভালো। চরিত্রবতী। পেটে তার টিউমার হয়েছে। আমি সে দিন টেকেরহাটে...।

শেষ হতে পারল না বাক্য। বারুদে আগুন পড়ার মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল সুরেশ্বরী–

তোমার 'সেদিন' দিয়া আমার দরকার নাই। গোঁসাই এহোন সাধু সাজে? প্যাটে প্যাটে এত বুদ্ধি? নিজের দোষ ঢাকার জন্য এহোন নতুন ফন্দি– বিন্দুর প্যাটে টিউমার আইছে? বুঝি না কিচ্ছু?

সাধন দেখল– বৃথা তর্ক। 'বাওনের শতমন্ত্র, পাঁঠার এক কানঝাড়া।' এরা এদের বিশ্বাসে অটল। ঘি দিয়া কি আগুন নেভানো যায়? আগুন আরও বেশি জ্বলে। তাই থম্ মেরে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। চোখ-কান খোলা রাখো। চোখ খুলে দেখো, কান তুলে শোন, কিন্তু জিভ ভুলে নাড়িও না। মুখটি খুলো না। চুপটি করে বসে থাকো। এ ছাড়া বাঁচা যাবে না জগতে। স্কুলের পণ্ডিত স্যারে একদিন একটা কথা বলেছিলেন– মানুষ গরুর কাছ থেকে কিছু শেখে না। তার কাছ থেকে একটা জিনিস শেখার আছে। নীরব থাকা। দেখবে। শোনবে। বলবে না। বোবাধন হয়ে বাঁচো। জড়রা সুখী এ জগতে। অনুভূতি থাকাটাই একটা বিড়ম্বনা। কেউ বিশ্বাসই করে না তার কথা। তাহলে বলে আর লাভ কী? মাটির প্রদীপের নিচের গাছা হয়েই তাই চুপ মেরে থাকল। উপরে প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগল তার বউ সুরেশ্বরী। আর সে আগুনের মুখরোচক আলো দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রামের পতঙ্গপাল। সুরেশ্বরী বলল–

– মাগি পলাইছে, আপদ গেছে। মরুক গিয়া বেঘোড়ে। তাতে কার কী?

কথায় বলে– সন্ন্যাসী চোর না দ্রব্যে ঘটায়। কাকটি উড়ল, তালটিও পড়ল। ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকাল ধনঞ্জয়, আর মৃত্যুঞ্জয়। বাইরে কড়া রোদ। জগাইকে দেখল না। উধাও। একটু পরে খবর পেল– বিন্দুও উড়াল দিয়েছে। ধনঞ্জয় আর মৃত্যুঞ্জয় মিলে দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করল। সভায় বসল। মনে পড়ল রাতের কাণ্ডকারখানা। প্রথমে ফুসুর-ফাসুর। পরে ঢুস্-ঢাস। হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে তাদের কাছে। অমনি দু'জন দু'জনার দিকে তাকিয়ে একে অপরকে ধরল জড়িয়ে। পেয়েছি, পেয়েছি। গলাগলি শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে দু'জন। ঠিক যাদুর মতো ফল হলো। দাবানলের মতো এ খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রামময়। এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। বেরিয়ে পড় পবিত্র প্রচারে। পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামে। এরপর অন্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ল খবরটা ম্যালেরিয়ার মতো। পাশের গ্রামের বি.এ. ফেল করা এক যুবক এসে সরেজমিনে সব তদন্ত করে, দেখে এবং শুনে এবং বলে মফস্বলের কোনো এক পত্রিকার জন্য খবরটা নিয়ে গেল টুকে। এভাবে শিরোনাম লিখল– 'সাধুর বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন'। যুবকটি চলে যাবার সময় পেছনে পেছনে অনেকদূর পর্যন্ত কিছু গ্রাম্য বালক-বালিকা তাকে অনুসরণ করে গেল। অবশ্য এ খবরটি কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কি না, তা আর জানে না গ্রামবাসী। প্রয়োজনও নেই তার। এ ঘটনার পরে এক সাংবাদিক আসছিল এবং কাঁধে একটা ক্যামেরা ছিল এটাই যথেষ্ট।

কোথাও পবে না শান্তি

যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূর দেশে।

জ্যৈষ্ঠের গরমে রাঙা হয়ে উঠছে আম। কাঁচা-পাকা আমে এক আলাদা স্বাদ। সাধনের সামনে তাপসী। দুপুরের প্রচণ্ড গরমে। গাছের ছায়ায়। হাতে তার গামলা। তাতে কুচ্‌কুচ্‌ করে কাটা লাল-সাদা আম। লবণ-মরিচ দিয়ে মাখানো। ঘ্রাণটাও ছুটেছে বেশ। তাপসী খাচ্ছে আর টক্‌টক্‌ শব্দ করছে মুখে। ফড়াৎ জল এসে গেল সাধনের জিভে। তাপসী খাচ্ছে আর কথা বলছে সাধনের সাথে। সাধনকে বলছে না খেতে। রাগ হলো সাধনের। এই পুচকে একটু মেয়ে, সেও তাকে অবহেলা করে? চড়াৎ করে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো গালে। কার গালে? তাপসীর? হঠাৎ তার মনে হলো– না, তাপসীর নয়, তার নিজের গালেই থাপ্পড় মারা উচিত নিজের। মানুষই নয় সে। জড়ভরত। মানুষ হিসেবে, বাবা হিসেবে, জীবন্ত একটা প্রাণী হিসেবে কেউ তাকে সমীহ করে না। আনমনে খেতে খেতে তাপসীর হাত থেকে ফটাৎ করে পড়ে গেল আমসুদ্ধ গামলা। আর কাটা আমগুলো গামলা থেকে সোনা ব্যাঙের মতো মাটিতে পড়ল লাফিয়ে। মনে মনে খুশি হলো সাধন। ভালোই হয়েছে। খা এখন? ভালো করে খা? এ সময় দ্রাম্‌দ্রাম্‌ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শব্দ হলো। বোমার আওয়াজ। একটু পরই কড়াৎকড়াৎ। কামানের শব্দ। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল দূরে আকাশে আগুনের পাহাড়। ধোঁয়ার মেঘ। জ্বলছে। জ্বলছে বোলতলি বাজার। মিলিটারি পৌঁছে গেছে গ্রামে। চোখে হতাশা– এখন উপায়? এক জায়গায় জড়ো হয়ে আগুন দেখে গ্রামের লোক। জ্বলছে সোনার বাংলা। সবচেয়ে উঁচু তেঁতুল গাছটার একদম মগডালে উঠে পরিস্থিতি দেখছে কয়েকজন যুবক। দেখল, বড় আগুনের আশেপাশে জ্বলছে আরও কতগুলো ছোটখাটো আগুন। জ্বলছে বাড়িগুলো। জ্বলছে দাউদাউ করে। আর রক্ষা নেই। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে আগুন। এগিয়ে আসছে তাদেরই গ্রামের দিকে।

প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে মানুষ। পাতিলভর্তি ভাত, হাড়িভর্তি চিড়া আর কলসিভর্তি জল নিয়ে বিলের দিকে পালাচ্ছে মানুষ। সূর্যোদয়ের আগেই। কেউ ধানক্ষেতে, কেউ পাটক্ষেতে। আর তেঁতুলগাছের যুবকরা পর্যবেক্ষণ করছে পরিস্থিতি। রামদা হাতে নিয়ে টহল দিচ্ছে একদল যুবক। দেখছে বচ্চারা কাঁদছে কিনা বা শব্দ করছে কিনা কেউ। তাহলে এক কোপে দু'ভাগ। কারণ, এক জনের জন্য প্রাণ যাবে সবার। মিলিটারি যদি টের পেয়ে যায় জনগণের ঘাঁটি, তবে সব শেষ। সবার মনে ভয়– এই বুঝি মিলিটারি ঢুকে পড়ে গ্রামে। সাধন পরিবারসহ আশ্রয় নিয়েছে পাটক্ষেতে। পাটক্ষেত যেন ভ্যাকুয়াম থার্মোফ্লাস্ক। উপরে মার্তণ্ড জ্বলছে আকাশে। উত্তপ্ত পাটক্ষেতের বায়ু। ভ্যাপসা গরম। শরীরে ঘামের বন্যা। দুর্গন্ধ। পায়খানা-পেচ্ছাব পাশাপাশি, কাছাকাছি। কোটি কোটি বিছাপোকা। গায়ের উপর দিয়ে চলে রেলগাড়ির মতো। বিছাকে ভয় পায় তাপসী। সাধনও। তাপসীর জামার ভেতরে একটা ঢুকে পড়েছে পির্‌পির্‌ করে। বাধ্য হয়ে জামা খুলতে হলো। যদিও যুবতী হয়ে ওঠে নি এখনও তাপসী, তবুও লজ্জা লাগল তার উদোম হতে। দেখল জামার চাপে কাসুন্দি হয়ে গেছে বিছা। সাধনের গায়েও পির্‌পির্‌ করে বেয়ে উঠেছে কয়েকটা। প্রচণ্ড রাগ হলো তার। বিছার উপর নয়। যারা যুদ্ধ বাঁধিয়েছে, তাদের উপর। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল– কত লোক তো ইন্ডিয়ায় যাচ্ছে পালিয়ে, সে ও যাবে। সবাইকে নিয়ে। সহ্য হয় না। এর চেয়ে কুকুরও ভালো।

A word of the faith that never balks.

Here or hence forward it is
all the Same to me, I accept
time absolutety.

মায়ের জন্য মনটা খুব কাঁদে শ্যামলীর। জুট মিলে একটা কাজ যোগাড় করে নিয়েছে তপন ইতোমধ্যে। পার্ট-টাইমে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজ এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়া চালিয়ে যাচ্ছে সে। সারাদেশে আন্দোলন। জুট মিলেও। মাঝে মাঝেই চলছে আন্দোলন। শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে। ধর্মঘট। মিছিল। মিটিং চলছে। স্লোগানে মুখর শহর। লক্ আপ হচ্ছে ফ্যাক্টরি। তালাবন্ধ হচ্ছে জুট মিল। আন্দোলনেও যোগদান করতে হচ্ছে। নইলে ঠেঙানি খেতে হয়। উত্তপ্ত শহর। টহলদারি মিলিটারি প্রায়ই টহল দিচ্ছে। জলপাই রঙের পোশাক দেখলেই গা শিউরে ওঠে। এরমধ্যে আবার শ্যামলী পীড়াপীড়ি করছে তার মাকে একটু দেখে আসতে। তার ইচ্ছে তপন পাশ করে জুটমিলে একটা চাকুরি পেলে তার মাকে নিয়ে আসবে কাছে। কিন্তু কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা সব বন্ধ। অনেক বলা কওয়ার পর একদিন গ্রামের দিকে রওয়ানা দিল তপন। গ্রাম থেকে যেহেতু সে পালিয়ে এসেছে তাই সে যাবে এবং এক রাত মাত্র থেকে লোকে টের পাবার আগেই চলে আসবে।
এক রাতে তপন এসে পৌঁছাল বিন্দুর বাড়ি। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে বেশ আগে। চুপিচুপি এসে দাঁড়াল বিন্দুর ঘরের সামনে। চালটা এক পাশে পড়েছে কাৎ হয়ে। দরোজাটা খোলা। আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘের চাদর। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। গায়ের জামা ভিজে আবার গায়ের তাপেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু দরোজায় উঁকি মেরেই রিরি করে উঠল শরীর। কেমন বোঁটকা একটা গন্ধ। ছাগলের পায়খানা পেচ্ছাবের গন্ধ। তবুও ঢুকল ঘরে। আগন্তুক দেখে ম্যা ম্যা করে উঠল গোটা দুই ছাগশিশু। বুঝতে বাকি থাকল না তপনের যে বিন্দু এখানে নেই। ভাবল– সাধনের বাড়ি থাকতে পারে। তাই কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করে চোরের মতো সাধনের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

সুরেশ্বরীর ধারণা– বিন্দু খারাপ মেয়েছেলে। জগাইর সাথেও ফষ্টিনষ্টি ছিল। তবে এ কাণ্ডটি তার গুণধর স্বামী ছাড়া কেউ ঘটায় নি। সাধনের ধারণা– বিন্দু ভালো মেয়েছেলে। জগাই ফুলিয়ে ফাসলিয়ে তারে ডুবিয়েছে। কিন্তু যখনই মনে পড়ে তার বাড়িতে থেকেই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে তখনই তার মেজাজটা যায় খিঁচড়ে। আর সাথে সাথে চুপ মেরে যায় সাধন। শুধু ভাবে, পৃথিবীতে তারই শুধু কোনো দাম নেই। এটাই তার বর্তমানের সার্বক্ষণিক চিন্তা। আর তাপসী ভাবছে– বিন্দুমাসি জগাই বাবর সাথে গিয়ে ভালোই করেছে। তার মা যে গালাগালি করতো?
বিন্দু চলে যাবার পর তার জন্য সাধনের ভাবনাটা গেছে আরও বেড়ে। শুয়ে শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। পাশেই সুরেশ্বরী ঘুমুচ্ছে অঘোরে। শুতে দেরি আছে, ঘুমুতে দেরি নাই। ও পাশে তাপসী। হ্যারিকেনটা রাখা হয়েছে চাপিয়ে। সারা ঘরটায় আলো-আঁধারির এক ভৌতিক ছায়া। চিৎ হয়ে শুয়ে সাধন চোখ খুলে তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। মশারিটা সাদা। মনে হচ্ছে সাদা একটা আকাশ যেন তার উপরে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল– না, এটা আকাশ নয়; তার মশারির ছাদ। তাতে কালো একটা ফুটো। মানে ছিদ্র। সাধন ভাবল– ঐ ছিদ্র দিয়ে মশা ঢুকেই তার রক্ত চোষা শুরু করবে। ভাবে– মশা কী সাংঘাতিক জীবরে? সামন্য ছিদ্রপথে ঢুকে রক্ত চুষে একেবারে পাকা তেলাকুচা। অথচ যার রক্ত খায়, টেরই পায় না সে। অমনি তার বিন্দুর কথা মনে পড়ল। পাপও মশার মতো। পবিত্রতার ছিদ্রপথে কখন যে পাপ তার সুঁচালো শুঁড় ঢুকিয়ে শুষে নেয় মানুষের মনের শুচিতা, টেরই পাওয়া যায় না। মশারির চালে সে ফুটোটা একমনে আবার দেখতে লাগল সাধন। আশ্চর্য! ফুটোটা হাঁটে। পির্‌পির্ পির্‌পির্ করে ছিদ্রটা হাঁটছে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে। তবে কি মনের ছিদ্রও স্থান, কাল, পাত্রবিশেষ নড়েচড়ে? ভাবল– হয়ত। কিন্তু তার খেয়াল হলো মশারিরর ছিদ্র হাঁটে; অথচ তা একটা ছারপোকা। কেন যেন মনে হলো ছারপোকাও তাকে ব্যঙ্গ করে। আর এ সময় 'সাধন কাকা' বলে বাইরে থেকে ডাকল তপন। তপন এসে দেখল ঘরে কোনো আলো নেই। দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। তাই কী করবে, ভাবছিল। এ সময় আলো জ্বলতেই আস্তে ডাক দিল–
– সাধন কাকা, আমি তপন, দরোজা খুলুন।
ডাকটা শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিল সাধন। নিজেকে সংযত করে এক পলক তাকাল তাপসী ও সুরেশ্বরীর দিকে। না জেগে নেই। অচেতন। নিঃশব্দে উঠে পড়ল। দরোজা খুলেই বলল– চুপ, তোমার মাসির যেন ঘুম না ভাঙে। কারণ, সাধনের ভয়, তপনকে দেখলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে।
সুরেশ্বরীর ঘুমকে সাধন কুম্ভকর্ণের ঘুম বলে আখ্যায়িত করেছে। অবশ্য সুরেশ্বরীও সাধনকে কুম্ভকর্ণ উপাধিতে ভূষিত করে তার গায়ের ঝাল ঝাড়ে মাঝেমাঝেই। আর তাপসী তো মেয়ে। ইঁদুরে কান কেটে নিয়ে গেলেও টের পাবে না। অতএব, তাদের ঘুম ভাঙল না। এবং নিঃশব্দেই তপনের প্রবেশ ঘটল। হাত-পা ধোয়ার পর তপনকে বলল– আইসো, জল দেওয়া ভাত আছে, লবণ-মরিচ দিয়া খাও। তপনকে পিড়িতে বসিয়ে পাতিলের ঢাকনা সরাতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল সাধনের মুখ। রাগে রাগ জল হয়ে গেল। অসহায় বদনে তপনের দিকে তাকিয়ে বলল– 'দ্যাখো, দ্যাখো বাবা কাণ্ড। আর ভাল্লাগে না।'

তপন উঠে গেল পাতিলের কাছে। দেখতে পেল– ভাতের উপর সামন্য জল। আর তাতে বাচ্চা ছেলের মতো সাঁতার শিখছে ছোট্ট একটা ইঁদুর। ঢাকনার ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে। এরপর দু'জন দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এবং এরপর উঠে এলো। শুয়ে পড়ল। আর কোনো কথা হলো না রাতে। বিস্বাদ হয়ে গেল সাধনের মনটা। তপনের পেটে ক্ষিধের চামচিকে ডাকছে। শুধু ভাবনা। তপন ভাবছে– শাশুড়ির কথা। তাকে দেখছে না। কোথায়, কে জানে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করারও সাহস পাচ্ছে না। ওদিকে সাধন ভাবছে তপনকে কী বলবে সকালে? সুরেশ্বরী তপনকে দেখে আবার চেঁচামেচি শুরু না করে? ফলতঃ কারোই ঘুম এলো না সারারাত। যে যার আপন ভাবনায় বিভোর। আর তাই ভোর রাতেই চোখের পাতা জুড়ে ঘুম এলো দু'জনার।

কুম্ভকর্ণের মতো যারা ঘুমায়, তারা আবার ভোরেই উঠতে পারে ঘুম থেকে। সুরেশ্বরী জেগে তপনকে দেখে চমকে উঠল। ঘুমন্ত মুখখানা কেমন নিষ্পাপ দেখাচ্ছে। কেমন একটু মায়া হলো তার। ভাবল, বিন্দুর কথা ছেলেটাকে জানানো ঠিক হবে না। কী জানি বিন্দুর জন্যও হয়ত তখন কিছুটা আর্দ্র হয়ে উঠেছিল মনটা। যা হোক সাধনও সুরেশ্বরী দু'জনেই খবরটা গেল চেপে। তাপসীও তপনকে দেখে খুব বেশি। কিন্তু, বিন্দু যে নেই, এটা তো বাস্তব? তপনকে কী বলে বুঝাবে? ফলতঃ এ কথা সে কথায় বেরিয়ে পড়ল আসল খবর। আগুন ধরে গেল তপনের মাথায়। ক্ষণকাল আর অপেক্ষা করল না সে। গ্রাম ত্যাগ করে চলল সে সেই ক্ষুধার্ত পেটেই। ভেতরে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ– গিয়েই বাসা থেকে বের করে দেবে শ্যামলীকে। কুলটার মেয়ের সাথে কীসের সম্পর্ক? কুলটার মেয়ে কুলটাই হয়। সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ল শ্যামলীর উপর। বিন্দুর ব্যাপারে তপনকে বলার সময় সুরেশ্বরী সাধনকে আর জড়াল না। স্বামীর নামে দুর্নাম বলতে লজ্জা করছিল তপনের কাছে। তাই জগাইর কথাই বলল। তপন বিশ্বাস করল সে কথা।

তপন যখন মেসে পৌঁছিল তখন পড়ন্ত বিকেল। কোনো মেঘ ছিল না আকাশে। রোদ ছিল মিষ্টি। বাসায় পৌঁছেই দেখল– শ্যামলী তার ঘরে শোয়া। বেশ নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন। জানালা খোলা। শ্বাসের সাথে সাথে ওঠা নামা করছে তার অষ্টাদশী বুক। মুখটা সামন্য কাৎ। শান্ত। নিষ্পাপ। বড় সুন্দর লাগছে তাকে এ মুহূর্তে। বড় মায়া হলো তপনের। এ সময় কেউ নেই অন্যরা। কাজে বেরিয়েছে হয়ত। তপনের সমস্ত রাগ করুণা হয়ে গেল। কেন যেন মনে হলো– ওর দোষ কী? কিন্তু, কী করে শ্যামলীকে সে বলবে এ খবর? কী বলবে তাকে যখন সে জিজ্ঞেস করবে তার মায়ের কথা? বলবে ভালোই আছে?

যৌবন যায়–
যৌবন-বেদনা যে যায় না?

বিশ্রস্ত আব্রুতে মিলিটারি ব্যারাক থেকে বেরুল এক মহিলা। শাড়ির এক প্রান্ত জড়ানো কোমরের সাথে। অন্য প্রান্ত নদীর জলের মতো মাটিতে তার পেছনে পেছনে ধায়। দেখলেই বোঝা যায়– সে উন্মাদিনী। ছোটে, থামে। হাসে, কাঁদে। গান ধরে। এলোপাথাড়ি বকে। চুলগুলো রুক্ষ। হাওয়ায় ওড়ে। মনে হয় 'মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে'। কাছে গিয়ে দেখলে চেনা যায়। এ বিন্দু। ধূসর ত্বকের অন্তরালে পাওয়া যায় বিন্দুর অস্তিত্ব। বিন্দু জানে যে সে নির্দোষ। অথচ তাকে নিয়ে গ্রামে যা রটেছে, এরপর তার মুখ দেখানোও ছিল অসাধ্য। সাধুদের প্রতি তার গড়ে উঠেছিল আগাধ ভক্তি আর অটল বিশ্বাস। তাতেও ফাটল। ধসে পড়ল বিশ্বাসের পাহাড়। যেখানে সে গেল একটু আশ্রয়ের খোঁজে, সেখানেই হিংস্র শ্বাপদ। রক্ষকই হলো ভক্ষক। এ লজ্জা ঢাকার জন্যই সে রাতের অন্ধকারে ছুটল গ্রাম ত্যাগ করে। কোথায়, তা সে জানে না। তাই পা বাড়াল পশ্চিমের দিকেই। যে দিকে চলছে জনস্রোত একটু আশ্রয়ের জন্য। বহুদূরে যেতে হবে তাকে। যেখানে কেউ চিনবে না। চিনতে পারবে না কখনও।

যুদ্ধে প্রাণের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ। ভারতের দিকে। সেও তাই সেই যাত্রীদের সাথে গেল মিশে। কিন্তু হাঁটার তেমন সামর্থ্য ছিল না তার। তাই পিছিয়ে পড়ল। ধরা পড়ল পাক হানাদারদের হাতে। যেতে হলো ব্যারাকে। অত্যাচারের শিকার হলো। উন্মাদ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পেল না। যৌবনই হলো যৌবনের সর্বনাশের কারণ। বিন্দু এখন পথে পথে ঘোরে। দিগ্বিদিক ছোটে।

Fight is the Salt of Existence.

রাত ভোর না হতেই আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল জগাই। তার বিশ্বাস– এখানের দিনের আলো আর ক্ষমা করবে না তাকে। তাই তারার আলো নেভার আগে, কাক ডাকার আগে জগাই পড়ল বেরিয়ে। আন্ধকারই যেন পালাবার একমাত্র পথ। চলে যেতে হবে দূরে কোথাও। ভারতের অচেনা প্রদেশে। সেখানে কোনো আশ্রমে নেবে আশ্রয়। সারাজীবন সাধনা করবে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। ছিঃ ছিঃ মানুষ হয়ে সে এত নীচ হলো কী করে? পশু আর মানুষে তাহলে প্রভেদ থাকল কী? পথে জোন বিক্রি করতে করতে চলছে সে। পৌঁছাল এসে বনগাঁ। বনগাঁ 'ইয়ুথ ক্যাম্পের' খোঁজ পেয়ে সেখানে গিয়ে হলো হাজির। সেখানে অন্ততঃ খাবার নিশ্চয়তা আছে। মুক্তি বাহিনীদের ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে। দেখেশুনে জগাইর কেন যেন মনে হলো যুদ্ধে গেলে মন্দ হয় না। দেশের জন্য যুদ্ধ করাটাও একটা সাধনা। মনে পড়ল ছেলেবেলা পড়া একটা কবিতার কথা–

আজকে খবর পেলাম খাঁটি
মা আমার এই শ্যামল মাটি।

জগাইর মনটা হঠাৎ দেশের জন্য আকুলি-বিকুলি করে উঠল। সিদ্ধান্ত নিল– আর সে সাধু হবে না। আর সে আশ্রমে যাবে না। ওখানে পাপ। বরং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। কিঞ্চিৎ হলেও হয়ত পাপক্ষয় হবে এতে। তাই সে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখাল বনগাঁ ইয়ুথ ক্যাম্পে। কিছুদিন প্রশিক্ষণের পর তাদের একটা ব্যাচ পাঠিয়ে দেয়া হলো বিহারে। চাকুলিয়া ক্যাম্পে। ৮ নম্বর সেক্টর। হাবিলদার রাজপাল সিং। এক সেকশনের কমান্ডার বাংলাদেশের আবদুর হাকিম। কিছুদিন ট্রেনিং নেয়ার পর তাদের পাঠানো হবে বাংলাদেশে। যুদ্ধে।

সবচেয়ে দুঃখী হলো সে

যে অন্যের মতো হবার চেষ্টা করে।।

কোনো ক্ষোভ, ঈর্ষা বা ঘৃণা মনে চাপা থাকলে তা আরও বাড়তেই থাকে। ঘুণ পোকার মতো কুঁরে কুঁরে নিজেকে ছিদ্র করে। আর মনে কোনো সন্দেহ থাকলে সে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, বিস্তার লাভ করে। বিন্দুর এ কলঙ্কের কথা শ্যামলীর কাছে গোপন রেখে গেছে তপন। প্রথমে ভেবেছিল শ্যামলীকে সে তাড়িয়েই দেবে। কেমন মায়া হলো। তাই তাড়াতে পারে নি। কিন্তু, গলায় কাঁটা বেঁধার মতো একটা সূক্ষ্ম অবজ্ঞা তার মনে বিঁধে থাকল। কখনও সখনও সেটা মনের দুর্বল মুহূর্তে উঁকি মারে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাদের মেসও চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। মাঝেমাঝেই সংঘর্ষ হচ্ছে শহরে। অন্য দু'জন চলে গেছে মেস ছেড়ে। একমাত্র সবুজ আছে। তার কথাবার্তা সন্দেহজনক। সারাক্ষণ শ্যামলীর সাথে পিটিস্ পিটিস্। সবুজকে একদম দেখতে পারে না তপন। নিজের ঈর্ষা এবং ক্ষোভে নিজেই জ্বলে জ্বলে মরে। প্রকাশ করে না। সবুজের সাথে মেশে, তাও নিষেধ করতে পারে না তপন। শুধু ভাবে– শ্যামলী কেন বোঝে না বিষয়টা? শ্যামলীর মনে অবশ্যই দোষ। আমি তো আছিই? সবুজ হলো উপরি পাওনা। আর তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। মনে পড়ে– জগাইর সাথে বিন্দুর পালিয়ে যাবার কথা। মনে হচ্ছে– শ্যামলীও বুঝি একদিন পালিয়ে যাবে সবুজের সাথে। যেমনি মা, তেমনি তার মেয়ে তো? যেমনি ছাঁচ, তেমনি তার পিঠে। সন্দেহ পাহাড় হলো। বৈশাখী মেঘের মতো ছেয়ে ফেলল মনের আকাশ। জমাট বরফের মতো জমে রইল সারা মন জুড়ে। গলল না একটুও। শ্যামলী তাই জানল না কতটা প্লাবন জমা তপনের বুকে।

কী আশ্চর্য জীবন আমার

প্রতিদিন সূর্যাস্ত ঘটে
অথচ সূর্যোদয় ঘটে নি একদিনও।

শহরের অবস্থা উত্তেজনাপূর্ণ। মিছিল মিটিং প্রতিদিন। তপন বাদ দেয় না একটাও। যোগ দেয় এবং সামনেই থাকে। কিছুটা হলেও অন্তত ভুলে থাকা যায় ঘরের অশান্তি। দিনটি ছিল ১৫ আষাঢ়। শহরে বড় রকমের একটা দাঙ্গা হয়ে গেল। মিছিলে গুলি হয়েছে। বহু লোক মৃত। শত শত আহত। বহু ধৃত। তপন ফিরল না। দিন ক্রমশঃ সন্ধের কোলে ঢলে। রাত তার কালো চাদরে ঢেকে দিল প্রকৃতি। বৃষ্টি কিংবা কোনো মেঘ ছিল না আকাশে। সন্ধে ক্রমশঃ রাত। তপন ফিরল না। শ্যামলী চিন্তান্বিত। কেবলই কান্না আসছে বুক ঠেলে। বহুলোক হতাহত। তাহলে কি...? আর ভাবতে পারে না। কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে। সবুজ চিন্তান্বিত। সান্ত্বনা দেয় শ্যামলীকে। তবে দুশ্চিন্তার ভেতর কোথায় যেন একটু শীতল ভালোলাগা লুকিয়ে রয়েছে সবুজের মনে। তপন নেই। শুধু শ্যামলী আর সবুজ। রোমাঞ্চ জাগে মনে। কিন্তু তপন নেই সে ভাবনাও তাকে বিদ্ধ করে। আহত করে। ভাবে– তপন আজ না আসুক, কাল যেন আসে। শ্যামলীর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয় সবুজ। শ্যামলীর দুঃখ আরও যায় বেড়ে। ডুকরে কান্না শুরু করে। মাথা থেকে পিঠে নেমে আসে সবুজের হাত। সবুজের মনে তখন অন্য চিন্তা। সরল মনে শ্যামলী সান্ত্বনার স্পর্শ পাচ্ছে পিঠে । সবুজ ভাবছে–
তপন যদি আর না-ই আসে ফিরে, তবে সে-ই তাকে বাসবে ভালো। সে-ই বিয়ে করবে শ্যামলীকে।
কল্পনায় অনেক দূর চলে যায় সবুজ। হঠাৎ শ্যামলী বলে–
– একটু খুঁজে দেখো না সবুজ দা। কোথাও পাওয়া যায় কি না?
সবুজ বলে– কোথায় খুঁজবো এত রাতে? কাল না হয়... আবার সেই চিন্তাটা দানা বেঁধে ওঠে সবুজের মনে– দোষ কী, তপন যদি আর নাই আসে ফিরে, তবে সে-ই তো নেবে দায়িত্ব? শ্যামলীও নেবে মেনে।
আবারও ভাবে– ধ্যাৎ, এ সব কী চিন্তা করছে সে? তপন না তার বন্ধু? বন্ধুর প্রেমিকাকে নিয়ে এ সব কী ভাবছে সে? এত নীচ তার মন? নিজের প্রতিই তার ঘৃণা হলো। তারপরও মনে যেন এক আশা জেগে থাকল, বন্ধু বুঝি আর ফিরবে না।

তাই হলো। রাত দুপুর। ফিরল না তপন। শ্যামলীর একা কেমন যেন ভয়ভয় করতে লাগল। অতি প্রিয়জনের মৃত্যু মানুষকে যেমন বেশি কাতর করে ফেলে, তেমনি অতি প্রিয় দেহটাও শব হয়ে গেলে সেটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় লাগে। শ্যামলীর ভয়– তপন বুঝি আর নেই এবং এ ঘরের বাতাসেই ঘুরে বেড়াচ্ছে তার আত্মা। সবুজকে তাই তারই ঘরে থাকতে অনুরোধ করল। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। সবুজ আমতা আমতা করার ভান করল, কিন্তু মনে মনে খুশিই হলো।

দু'জন দু'চৌকিতে শুয়ে। আলো জ্বলছে ঘরে। কারো চোখেই ঘুম নেই। শুধু ঘুমের ভান করে থাকল পড়ে। সবুজ ভাবছে শ্যামলীকে। শ্যামলী ভাবছে তপনকে। এই-ই হয়। আমি যাকে ভাবি, সে ভাবে না আমাকে। আবার আমাকে যে ভাবে, আমি তাকে ভাবি না। অথচ আমরা সবাই আপন আপন ভাবে বিভোর– আমি যাকে ভাবি সেও বুঝি আমাকে ভাবে। আর এই ক্ষীণ আশার টিমটিমে আলোতেই জীবন বেঁচে থাকে।

তপন এলো না। পরদিনও না। তার পরদিনও না। এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন। নানা জায়গা খুঁজল সবুজ। হদিস পেল না। কতজন ধরে নিল জেলে, কতজন মারা গেল, কিছুই জানা যায় নি। শহর গরম। বোমা ফাটে। মিলিটারির কামান ওঠে গর্জে। আগুন জ্বলছে শহরে। এখানে সেখানে। শহর এখন বারুদের স্তূপ। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। কিন্তু, তপন ফিরল না। সবুজ আর শ্যামলীইবা কী করবে?

একদিন বিকেলে, তাদের পাড়ার একটা বাড়িতে জ্বলে উঠল আগুন। শহরে আর থাকা যায় না। চলে যাবে গ্রামে। শ্যামলীকে প্রশ্ন করল সবুজ– সে কোথায় যাবে। কিছুই জানে না শ্যামলী। শুধু কাঁদছে। গ্রামেও তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। কী করে মুখ দেখাবে? সবুজও অনেক বুঝাল তাকে– গ্রামে যাওয়াই এখন নিরাপদ। অবশেষে রাজী হলো শ্যামলী।

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো

বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।।

শ্যামলীকে নিয়ে সবুজ রওয়ানা দিল শ্যামডাঙার দিকে। যে গ্রামের লোক বসে আছে শ্যামলীকে থুতু দেয়ার জন্যে। শ্যামলী ভাবল প্রথম একটু গঞ্জনা সইতে হবে। পরে সয়ে যাবে। কত আর বলবে লোকে? কিছুদূর আসার পর বাস, এক দুর্বুদ্ধি এলো সবুজের মাথায়– তপন তো ফিরবে না আর কোনোদিন। অবশ্যই মারা গেছে গুলিতে। বন্ধু হিসেবে তারও একটা কর্তব্য আছে শ্যামলীর প্রতি। তবে এ মুহূর্তে শ্যামলীকে এ সব বললে ফল হবে উল্টো। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল– সামনের স্টপেই নেমে বাস পাল্টে চলে যাবে তাদের গ্রামে।

মানুষ যখন কোনো কিছু পাবার লোভ করে, তখন স্বপক্ষে যুক্তির অভাব হয় না। তাই তার অকাট্য যুক্তি– শ্যামলীকে রক্ষা করা তারই কর্তব্য। অতএব, শ্যামলী তারই। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। বাস পাল্টে অন্য বাসে বসে চেপে। কোন পথে এসেছিল শ্যামলী, তার মনে নেই। ভুল পথ তাই চিনতেও পারল না। সন্ধেয় এক স্টপে নামল বাস থেকে শ্যামলী ও সবুজ। কেবলই মনে হতে লাগল শ্যামলীর এত সময় তার লাগে নি আসার দিন। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে– এ পথ তার অচেনা। ভাবল– চেনা পথও দীর্ঘ দিনে অচেনা হয়ে যায়। অন্ধকার পথে অন্ধকারের দিকে চলছে শ্যামলী। সামনে যে অনন্ত অন্ধকার। সব রঙ শুষে নেয় অন্ধকার তার কালো শুঁড় দিয়ে। তাই তপনের জ্যোতি বা সবুজের রঙ দেখতে পায় না শ্যামলী। সামনে হাঁটে তার এক অন্ধকার প্রেতচ্ছায়া। সবুজকে তার ভয় হয়। মনে হয় অচেনা। রহস্যময়। কিন্তু উত্তুঙ্গ তরঙ্গে নিমজ্জিত মানুষ খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরতে চায়। এ মুহূর্তে তাই সামনের চলমান অন্ধকারইতার পথ প্রদর্শক।

দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পর একটা বাড়িতে ওঠে সবুজ। ঘরে দেয় পা। ভেতরে ডাক দেয় শ্যামলীকে। এ ঘর তার অচেনা। এটুকু বুঝতে পারে এ ঘর তাদের নয়। আঁৎকে ওঠে শ্যামলী। এ কোথায় এলো সে। সবুজ প্রণাম করে তার বাবা-মাকে। বলে– ও আমাদের মেসের ঝি। কেউ নেই ওর। শহরে যুদ্ধ। তাই চলে এসেছি। যাবার জায়গা নেই বলেই ওকে নিয়ে এসেছি। আকাশ ভেঙে পড়ল শ্যামলীর মাথায়। এতদিনে যে বিশ্বাস জমা হয়েছিল সবুজের প্রতি মুহূর্তে তা ধ্বসে গেল। বিশ্বাসের পাহাড়ে ধরল ফাটল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ফুঁসে উঠল ঘৃণার বিষাক্ত ফণা। শ্যামলীরা সব সময় ঝি হয়ে যায়। জন্মই যেন তাদের ঝি হবার জন্য। কিছুই বলল না সে। মেনে নিল সবই। মেনে নেয়া ছাড়া অবলার আর কিছু নেই করার। সমাজই বাধ্য করেছে মেনে নিতে এ পুরুষের নিয়ম। তাই মুখ বুঁজে সহ্য করে গেল শ্যামলী।

শ্যামলী এখন রান্নার কাজ করে সবুজদের ঘরে। মুখ বুঁজে সহ্য করে অপমান। নিভৃতে নিরালায় ফেলে চোখের জল। একদিন রাতে সান্ত্বনা জানাতে আসে সবুজ। রাত গভীর হলে শোক উৎলে ওঠে তার। সবুজের সে সান্ত্বনার চোখে চকচক করে তপস্বী বেড়ালের লোভ। মুহূর্তে ভাজা মাছ হয়ে যায় শ্যামলী। সে গন্ধে ছোঁক ছোঁক করে সবুজ। পালাবার পথ খোঁজে। পায় না। কারণ, গন্তব্য অজানা। সবুজ বলে–

– তপনের আশায় আর পথ চেয়ে কী হবে শ্যামলী? সে আর ফিরবে না কোনোদিন। আমারও মন কাঁদে বন্ধু শোকে। বন্ধুর অবর্তমানে তোমার দায়িত্ব নেয়া আমার কর্তব্য। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

জবাব দেয় না শ্যামলী। ভাবে– কত নীচ মানুষের মন। কার মনের কোন্ কানাগলিতে কী পাপ লুকিয়ে আছে, তা কেউ জানে না। শিকার পেলেই ফুঁসে ওঠে ভেতরের ক্ষুধার্ত শকুন। মনে পড়ে যায় ময়ের কথা। সেদিন রাতের কথা। মা তার ফিরছে আশ্রম থেকে। কেউ জানে না, অক্ষম স্বামীকে ফেলে বিন্দু যায় আশ্রমে। সবাই জানে বিন্দু ভালো। কিন্তু শ্যামলী জানে– মা তার খারাপ। কী আশ্চর্য পৃথিবী। বাইরেটা দেখে কিছুই চেনা যায় না মানুষকে। মানুষ যেন পচা ডিম। খোসা না ভাঙলে টের পাওয়া যায় না তার ভেতরের দুর্গন্ধ। মানুষকে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব বলে মনে হয় শ্যামলীর এ মুহূর্তে। মানুষ যেন নরকের নষ্ট কীট। বলেই চলে সবুজ–

– কোনোদিন হয়ত এ বিয়েতে মত দেবে না আমার বাবা-মা। তবুও আমি তোমকে চাই। চলো চলে যাই অন্য কোথাও।

এবারেও নিশ্চুপ শ্যামলী। শুধু কান্নার ফোঁসানি হয়। বাতাসেরও কান আছে। বাতাস গোপনকে পৌঁছে দেয় মানুষের কানে। নির্ভয়ে ফুসুড়-ফাসুড় শুনে ফেলে সবুজের মা। বুঝতে পারেন– ছেলেটি মজেছে ঝিয়ের প্রেমে। চতুর মহিলা। দুর্নামের ভয়ে অনর্থ বাঁধালেন না। চুপ মেরে থাকলেন। সবুজ সরে গেলে তিনি এলেন। ঝিকে কুলটা, বেশ্যা মাগি ইত্যাদি বলে গায়ের ঝাল ঝাড়লেন। রাত থাকতেই বাড়ি থেকে বিদেয় হতে বলে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

শ্যামলী কাঁদল না একটুও। অশ্রু গেছে বাষ্প হয়ে উড়ে। শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে চোখের সাগর। ধরেই নিল সে এ ধিক্কার তার প্রাপ্য। মনে মনে প্রস্তুত হলো চলে যেতে হবে। রাতের অন্ধকারেই যেতে হবে চলে। পালিয়ে যাবে সে এই খপ্পর থেকে। কোথায় তা জানা নেই। তবে জানে– তাকে যেতে হবে। যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই তার। সে এখন পথের ধুলা। পথের হাওয়াতেই সে উড়বে, যে দিকে হাওয়া নেবে উড়িয়ে। তাই রাত পোহাবার আগেই সে বেরিয়ে পড়ে। সে নিশ্চিত পথে তার

অনেক বিপদ। হরিণশাবক দেখলেই বাঘের জিভে আসে জল। মানুষের ভেতরের পশুটা ওঁৎ পেতে থাকে কখন নধর নারীদেহ পাওয়া যাবে নিভৃতে। তবুও পথ চলে শ্যামলী। কারণ পথই তো তার একমাত্র সঙ্গী। পথই তার একমাত্র পাথেয়।

জীবন যেন দীর্ঘ সুতোয় বোনা

এক রঙিন মাফলার
স্মৃতির প্রান্ত খুলে টান দিলে
খুলে যায় সকল বাঁধন।।

বারোদিন পর জেল ভেঙে বেরুল একদল কয়েদি। জেল পালিয়েই তপন প্রথম ছুটে এলো মেসে। নেই। কেউ নেই। শ্যামলী নেই। সবুজ নেই। ধূসর প্রান্তর। চন্ করে আগুন ধরে গেল মাথায়। পালিয়েছে? শ্যামলীকে নিয়ে সবুজ পালিয়েছে। তলে তলে এই ছিল? আগেই এরকম একটা কিছু আভাস পেয়েছিল তপন। না, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। ভালোবাসার ভেতরেও খাদ। প্রেমের বুকে পাপ। শ্যামলী তো তাকেই ভালোবেসে সংসার ছেড়েছিল? মনে হলো, যে একবার সংসার ছাড়তে পারে, সে দশবারও ছাড়তে পারে। কুলটার মেয়ে কুলটাই হয়। ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল মন। তবুও কোথায় যেন একটু ভালোবাসা, কোথায় যেন একটু মোহ শ্যামলীর জন্য থেকে যায় মনের কোনায়। ভালোবাসা এমন এক দুরন্ত আগুন যে দহনও করে আবার আলোও দেয়। নিঃশেষ হয় না ভালোবাসা– শেষ হলেও রেশ থাকে। থেকে যায়। যে চলে যায় সে স্মৃতি রেখে যায়। এ মূহূর্তে কাছে পেলে শ্যামলীকে গুলি করে ফেলতে পারে তপন। অথচ তারই জন্য মনটা কেমন করে। তার জন্যই তাকে গুলি করতে ইচ্ছে করে। তাকে পাওয়ার জন্যই তাকে হারাতে ইচ্ছে করে। কী বিচিত্র মানুষের মন। বিচিত্র তার গতি? অদ্ভুত তার প্রকৃতি। মনে পড়ে সেদিনের কথা– তোমাকে পেয়েছি আরও বেশি করে পাবার জন্য। অথচ...। ব্যথায় মুষড়ে ওঠে বুক। শ্বাস কষ্ট হয়। প্রবল বেগে আসে কান্নার প্লাবন। হায় ভালোবাসা! এ কেমন দহন!! যার জন্য এ মুহূর্তে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছে মন, তাকেই পাবার জন্য এ কেমন তৃষ্ণা? কোনোই আশা থাকে না যখন, তখনও আশার ক্ষীণ এক শিখা জ্বলে মানুষের মনে। ভালোবাসা যেন হৃদয়ের সলতেয় জ্বলা নিঃসঙ্গ শিখা। তপন ভাবছে–

এমনও তো হতে পারে, শহরের অবস্থা খারাপ দেখে গ্রামে ফিরে গেছে শ্যামলী। হয়ত সবুজই এসেছে রেখে। সবুজ হয়ত তারপর চলে গেছে বাড়ি। ভাবনাটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো তপনের। তাই তো? মিছিমিছি সবুজকে সন্দেহ করা কেন? নিজের প্রতি নিজের করুণা হলো। সবুজকে সে অবিশ্বাস করল কেন? সিডনি স্মিথের সেই উক্তি পড়ল মনে– 'প্রমাণ না পেয়ে কাউকে অবিশ্বাস করো না।' নিজের মূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হলো সে।

সাথে সাথে শ্যামডাঙার পথ ধরল। তপন গ্রামে যখন পৌঁছিল তখন রাত। নিজের বাড়ি গেল না। সোজা চলে এলো সাধনের বাড়ি। শ্যামলী নেই। আসে নি। একথা শোনার পর দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। এবার সে নিশ্চিত, দু'জন ভেগেছে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে। পা বাড়াল বাইরের দিকে। হাহা করে উঠল সাধন–

এই রাতে কই যাও বাবা? ব্যাপার কী? কই গেছে শ্যামলী? কোনো জবাব দেয় না তপন। জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। জবাব জানাও নেই। জীবনের ক'টা প্রশ্নের জবাবইবা জানা থাকে? সে চলে। চোখে সুদূরের নেশা। হনহনিয়ে গেল বেরিয়ে। কোন্‌দিকে, তারও ঠিক নেই। তবে আপাতত শহরের দিকে।

সুরেশ্বরী অবাক। তাপসী বিস্মিত। আর সাধনের পাচ্ছিল প্রচণ্ড কান্না। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সাধন। সে কিছুই বোঝে না এ পৃথিবীর– কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়। বড় দুর্বোদ্ধ আর জটিল লাগে তার কাছে পৃথিবী। অদ্ভুত লাগে মানুষ। আরও জটিল লাগে মানুষের মন। কেউ কিছু বুঝিয়ে বলেও না তাকে। সবাই প্রহেলিকা করে কথা বলে। সহজ কথা সহজভাবে কেউই বলে না কাউকে। এ কেমন পৃথিবী? সব যেন তার কাছে অচেনা হয়ে যায়। এই গাছ, এই মাঠ, মানুষজন– সব অচেনা। সে যেন ভিন্ন গ্রহের আগন্তুক। সামনে দাঁড়ানো মেয়ে তাপসী। চিনতে পারে না তাকে। সামনে বউ সুরেশ্বরী। সেও অচেনা। সব অচেনা। সাধন ভাবে– আমি কে? উত্তর পায় না। আমার কাজ কী? জানে না। আমার উদ্দেশ্য কী? বোঝে না। সহসা তার মনে হলো– আমি মৃত। আবার ভাবল, মৃতেরা কি ভাবতে পারে? একটা সহজ বুদ্ধি এলো মাথায়। ভাবল– চিমটি কেটেই দেখি না আমি মৃত না জীবিত? নিজের বাঁ হাতে নিজেই চিমটি কাটল ডান হাত দিয়ে। না, ব্যথা নেই। আরও জোরে। না, কোনো ব্যথা নেই। আরও জোরে মারল চিমটি। না, একটুও ব্যথা নেই। সন্দেহ হলো। সে মৃত। আবার চিমটি কাটল। সর্বশেষ চিমটি। রাগে খানিক মাংসই ছিঁড়ে আনল খামচে। ব্যথা নেই কোনো। নিজের মাংসকেও ঘৃণা লাগল। চোখের সামনে আনল। দেখে– মাংস নয়। তুলো। বালিশের তুলো। বালিশ ছিঁড়ে এনেছে। বালিশের উপর হাত ছিল। হাতে চিমটি কাটতে গিয়ে বালিশে চিমটি কেটেছে। রাগে তার মরতে ইচ্ছে হলো। নিজের শরীরও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে? ছেঁড়া তুলোটুকু যেন নিজের মাংস হলেই বেশি খুশি হতো সাধন। রাগে তার রাগ জল হয়ে গেল। তাই থম্ মেরে বসে থাকল। তাপসী ডাকল– 'বাবা'

সাধন শুনল– দূর সমুদ্রের ওপার থেকে কে ডাকে– 'বাবা'। সাধন ভাবল– কে ডাকে? বিড়ালছানা?

সে কোনো সাড়া দিল না। বুঝল– ও মায়া। মায়ার খেলা। সংসারের সঙ। কুহকিনীর পাল্লায় পড়েছে সে। আবার ডাকল তাপসী– বাবা, শ্যামলীদির কী হয়েছে? এইবার সংবিৎ ফিরে পেল সাধন। বলল– 'শ্যামলী? হ্যাঁ, শ্যামলী'

আবার খেই হারিয়ে ফেলল। বলল–

– 'শ্যামলী যেন কে? ও হ্যাঁ, স্কুলে ছেলমেয়েরা গায়– 'পুরব বাংলা, শ্যামলী মায়। তা, তা শ্যামলী মায়ের অবস্থা করুণ। শ্যামলী বাংলা এখন পুড়ে খাঁক। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় স্কুল। কোথা থেকে একদল তরুণ এসে ফড়াৎ ফড়াৎ ছিঁড়ে ফেলে চান-তারা মার্কা পাকিস্তানি পতাকা। ওই তো তোর ভাই তা দিয়া জাম রাখা থলি বানাইছে। গাছে ওঠে আর পতাকার থলি ভরে জাম পাড়ে।'

কিছুই বুঝল না তাপসী। বুঝল– বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই 'মা মা' করে জুড়ে দিল কান্না। সাধনের মনে হলো– বিড়ালের ছাও কান্দে। তাও দূরে কোথাও। অন্য গ্রহে। সাধনের মনে হলো, সে একটা বুদ্বুদ। বুদ্বুদের মাঝের শূন্যতা, যে আরও ভাসছে শূন্যে।

নিশ্চয়তার আর এক নাম জন্মভূমি ॥

বন্ধু কখনও শত্রু হলে, সে হয় ভয়ঙ্কর শত্রু। ভালোবাসার জন যদি ভলো না বাসে, তবে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা লাগে তাকেই। তপনের মাথায় এখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু। সহস্র সহস্র উন্মাদের আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তোলে তপনের মগজে–

শ্যামলী পাপিষ্ঠা। ওকে সে ঘৃণা করে। ভাবে– শহরে গিয়ে সে কী করবে? জেল পালানো দাগি আসামী সে। ধরা পড়লে গুলি। সিদ্ধান্ত নেয়– যুদ্ধে যাবে। স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করে মরবে। আর না হোক যুদ্ধ তার স্মৃতি থেকে মুছে দেবে প্রিয়জন হারানো বেদনার রঙ। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবে শ্যামলীর সব স্মৃতি। যুদ্ধ তাকে ডাক দেয়। চলে যায় বনগাঁ ইয়ুথ ক্যাম্পে। ওখান থেকে বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে। ৮ নম্বর সেক্টর। কমান্ডার রাজপাল সিং। দীর্ঘ মানুষ। মুখভরা দাড়ি। মাথায় পাগড়ি। চোখে আগুন। এরকম খ্যাপা না হলে যুদ্ধ হয়?

ট্রেনিং চলছে পাহাড়ের পাদদেশে। পিছে জলের বোতল। গুলির ব্যাগ। বুকে গুলির ফিতা। এক একটা গুলি যেন শ্যামলীর স্মৃতি। দু'কনুইয়ে ভর দিয়ে রাইফেল তাক করে ক্রলিং করে এগুচ্ছে সামনের দিকে। ঝাঁকেঝাঁকে মুক্তিযোদ্ধা। ভেসে আসে কমান্ডারের জোরাল কণ্ঠস্বর– March on. Remember, you are freedom fighters. your nation is great than your life. Die, but save your Country. আপ জলদি চ্যালতা হ্যায়। কুচ্ পরোয়া নেহি। আগে ভি, পিছে ভি, ডাইনে ভি, বায়ে ভি তেরা দুশমন। চ্যালো।

সামনে চলা ছাড়া কিছুই বোঝে না সৈনিক। রক্ত ঝরছে কনুইয়ের চামড়া ছিঁড়ে। ব্যথা নেই। আগে ছিল। এখন সয়ে গেছে। স্থানটা বোধহীন। শুধু রক্ত ঝরছে অঝোরে। তাও থেমে যাবে হয়ত এক সময়। সব কিছুরই শেষ আছে। দুঃখের? একমাত্র দুঃখেরই শেষ নেই। দুঃখ হলো শূন্যতা। কী যেন নেই– এর বেদনা। শূন্যের শেষ নেই। শূন্য সীমাহীন। দুঃখও তাই। পাশের দিকে হঠাৎ নজর পড়ায় চমকে ওঠে তপন। তার থেকে কিছু দূরের একজনকে তার পরিচিত বলে মনে হলো। চেনাচেনা, অথচ সম্পূর্ণ চেনা নয়। বারবার তাকাচ্ছে, আর ক্রলিং করে এগুচ্ছে সামনে। হঠাৎ কেমন যেন হয়ে পড়ে তপন। সে চিনেছে। এ জগাই। দাড়ি কামিয়েছে। মাথার চুল খাটো করেছে। আগুন জ্বলে উঠল মাথায়– এই হারামজাদাই পালিয়েছে তার শাশুড়িকে নিয়ে কোনো এক রাতের অন্ধকারে। এরই জন্য তার গ্রামে যেতে হয় চুপিচুপি অন্ধকারে। অন্ধকারে যার শুরু, সারাজীবন তার অন্ধকারেই কাটে। আর শেষও হয় অন্ধকারে। আবার ভাবে– শাশুড়ি? কে শাশুড়ি? ওই কুলটা? কুলটার মেয়েও তো কুলটা। মা ভেগেছে একটাকে নিয়ে, আর মেয়ে অন্যটা। দু'টোই পাপিষ্ঠা। জগাই আর সবুজের কী দোষ?

কিন্তু, তাই বলে একটুও রাগ কমল না তার। ফুলিয়ে-ফাসলিয়ে কিনা তার শাশুড়িকে নিয়ে পগারপার? শয়তানটাকে ইচ্ছে করছে গুলি করতে। ভণ্ড কোথাকার? পালিয়ে এসে এখন মুক্তিযোদ্ধা? কৌপিন ছেড়ে গায়ে এখন যোদ্ধার উর্দি। বিন্দুকে কোন্ ভাগাড়ে ফেলে এসেছে কে জানে? হঠাৎ পাছায় বুটের লাথি–

– হাই, আপ কাঁহা যাউঙ্গে? সমানে চ্যালো।

জগাইর কথা ভাবতে ভাবতে এবং তাকাতে তাকাতে একটু পিছিয়ে পড়ে তপন। তখনই হাবিলদার দিল লাথি।

ওকের মতো শক্ত না হয়ে

উইলোর মতো নমনীয় হও॥

ভাবনা এমন এক ব্যধি যা মন থেকে যতই ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইবে, মনকে তা ততই বেশি করে জাপটে ধরবে। জগাইকে দেখার পর থেকে মোটেই সহজ হতে পারছে না তপন। এক ঘৃণা, ক্ষোভ অহরহ দহন করছে তাকে। প্রতিহিংসা ধ্বংস করে দিতে পারে একজন মানুষকে। কোনো কাজেই মন বসাতে পারছে না তপন। ভাবনার কাঁটাগুলো বিদ্ধ করে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে– এই পাষণ্ডই তার শাশুড়ির সর্বনাশ করেছে। একে সে কোনোভাবেই ক্ষমা করবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি করে মারবে। সুযোগই পাচ্ছে না। জগাইও চিনতে পেরেছে তপনকে। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না সাহস করে। কী বলবে? কীভাবে বলবে? এই করে করে বলা হয় নি। আর তপনও সুযোগ খুঁজছে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার। আবার ভাবে– কী দরকার? যার জন্য সমাজ ছাড়লাম, সে-ই গেল আমাকে ছেড়ে। তাছাড়া জগাইও মুক্তিযোদ্ধা।

সহযোদ্ধার প্রতি সহযোদ্ধার এ কী মনোভাব? কিন্তু কিছুতেই বুঝ মানে না মন। মাথা থেকে কোনোভাবেই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না এ চিন্তাটাকে। কেবলই মনে হয়– জগাই পাপী, পাপীকে শেষ করো।
অন্যমন বলে– প্রবাদ আছে, পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করো। আবার ভাব– পাপ করে বলেই তো পাপী, পাপী যদি পাপই না করত তবে তো সে পাপীই হতো না? আর ঘৃণারও প্রশ্ন উঠত না? দোষ তো পাপীরই? পাপী আর পাপকে পৃথক করে দেখে হয় বোকারা, নয় তো দুর্বলরা। কিন্তু, পাপটা কী? এক দার্শনিক বলেছেন– There is no sin in this world. পৃথিবীতে কোনো পাপ নেই। পাপ বলে কিছু নেই। পাপ হলো মানুষের মনে। পাপ-পুণ্য আপেক্ষিক ব্যাপার। অন্যে যেটাকে পাপ মনে করে আমি সেটাকে পাপ মনে নাও করতে পারি। এ সমস্ত যুক্তি-তর্ক ঝড় তোলে তপনের অন্তরে। তবে সে বোঝে– জগাইর প্রতি থেকে এক রত্তি ঘৃণা কমে নি তার। তাকে নিঃশেষ করে না দিলে এ অন্তর্জ্বালাও নিঃশেষ হবে না তার। তাই সুযোগ খুঁজছে তপন।

I pass death with the dying

and birth with the new wash'd babe.

ট্রেনিং শেষে আব্দুর হাকিমকে কমান্ডার করে মুক্তিযোদ্ধার একটা দল পাঠিয়ে দিল মানিকগঞ্জে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগাই আর তপন একই দলে। তুমুল সংঘর্ষ হলো ক'দিন। তিনজন সহযোদ্ধাকে হারাতে হলো। পঞ্চম দিন চলছে fight। ক্রলিং করে এগুচ্ছে ওরা উঁচু-নিচু লাল মাটির ঢিবির আড়ালে আড়ালে। কাঁটাগাছ আর ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির মতো দু'দিক থেকে ঝরছে গুলি। হঠাৎ তীব্র এক চিৎকার। আঁৎকে উঠল তপন। ডান কাঁধে একটা গুলি এসে লাগল জগাইর। এ কী হলো? ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেল তপনের। দ্রুত সরে এলো জগাইর কাছে। কেন যেন মনে হলো– আগে প্রাণটা বাঁচাতে হবে সহযোদ্ধার। তাই কোনোমতে কাঁধে বাঁধিয়ে জগাইকে পেছন ফিরে চলল ক্রলিং করে। জগাইর মতো এমন পরম বন্ধু যেন আর নেই তপনের– তাই মনে হলো এ মুহূর্তে। সমস্ত ঘৃণা, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা জল হয়ে গেল তার। একমাত্র জগাই-ই ছিল তার পূর্ব-পরিচিত। তার মৃত্যুও সে কামনা করত। কিন্তু এ মৃত্যু যে এত চরম ভয়ঙ্কর তা একবারও বুঝতে পারে নি তপন। মৃত্যু যেন তপনকে উপহাস করে চলে গেল। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হলো প্রচণ্ড। এমন মৃত্যু তো চায় নি তপন। তাছাড়া ঘৃণার মধ্যেও কোথায় যেন একটু ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল, তা আগে পায় নি টের। চরম শত্রুও কখনও কখনও পরম বন্ধু হয়ে যায়। মৃত্যু হলো মহাসাম্যসংস্থাপক। Death is great Equalizer. কেউ মারা গেলে তখন আর সে নামক ব্যক্তিটি থাকে না । থাকে মাত্র একটা জড়দেহ। তার সাথে কোনো রাগ বা অভিমান চলে না। খুব কান্না পাচ্ছিল তপনের। যেন সে তার সহোদরকে হারাচ্ছে। একটু সরে এসে মাথাটা নিল কোলে তুলে। মারাত্মক জখম হয়েছে। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করতে শুরু করল। জগাই বুঝল– সময় আর বেশি নেই। তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করে বলল– আমি পাপী ভাই, আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভণ্ড ছিলাম। পাপ ছিল মনে। তাই স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না। তবে এখন আর পাপ নেই। যুদ্ধে কোনো ফাঁক ছিল না আমার। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত। এটুকু বলার ছিল– তোমার শাশুড়িকে ভুল বুঝ না।

বুক ঠেল কান্না এলো তপনের। যুদ্ধক্ষেত্রে কি কান্না শোভা পায়! মন খুলে একটু কান্নাও করা যাবে না সবসময়? ভুলে গেল তপন, কান্নার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ভূ-খণ্ড নেই পৃথিবীতে। নেই নির্দিষ্ট সময়। অথচ কান্নাকেও কখনও সখনও লুকিয়ে রাখতে হয় ফল্গুধারার মতো। জগাইর কথাগুলো বিদ্ধ করল তপনকে নিশাতের তীরের মতো। এই কি এ কথা বলার সময়? তপন তো কোনো দোষ দিচ্ছে না জগাইকে? তবে কি তার মনোভাব টের পেয়ে গেছে জগাই? মানুষ কি এভাবে মানুষের মনের ভেতরের কথা দেখতে পারে? না হলে জগাই কী করে বুঝল তপনের মনের ভাব? নিজের প্রতি করুণা হলো তপনের। ঘৃণাও হলো। লজ্জা লাগল প্রচণ্ড। এ কী অনর্থ ভেবেছে সে? এত খারাপ সে ভাবতে পারল জগাইকে? মানুষের স্বভাবই এই। সব কিছুতেই সন্দেহ। না জেনে না শুনেই মানুষকে দোষ দেয়। জগাই বলল–

– তোমাকে একটা কথা বলি– আগে আমি সাধু ছিলাম না। ভালোবাসাই আমাকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে। যে মেয়েকে ভালোবাসতাম সে চলে গেল ত্যাগ করে। তারপর সব গোলমাল হয়ে গেল। তুমি শ্যামলীকে ভালোবাস। ভালোবাসার মতো পবিত্র কিছু আর নেই। সারাজীবন মানুষ ভালোবাসা খোঁজে। পায়ও। কিন্তু বুঝতে পারে না যে পেলাম। যখন হারিয়ে যায় তখন বুঝতে পারে, পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন আর সময় থাকে না ফিরে পাবার।

সন্ধে হলো। তাঁবুতে ফিরল সবাই। ক্রমশঃ অবনতি হচ্ছে জগাইর। গভীর রাতে সব শেষ। বাঁচাল না জগাই। মরার আগে বলে গেল–

– আমি চললাম, আমর অপূর্ণ আশাকে পূর্ণ করো। তাহলেই আমি ক্ষমা পাবো।

নিজকে সংযত রাখতে পারল না তপন। কেঁদে দিল। বিমূঢ়ের মতো থাকল বসে। ভোরেই বেরুতে হবে যুদ্ধে। ঝেড়ে ফেলতে হবে শোক। বাকি নেই ভোর হতে আগুনের রঙের আভাস পাওয়া যাচ্ছে পুব আকাশে। তপনের একটা কবিতা মনে পড়ল–

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।

বিপুল এক শূন্যতা আচ্ছন্ন করল তপনকে। যার মৃত্যু ছিল কাম্য প্রতিমুহূর্তে তার মৃত্যুই যেন তাকে আরও প্রিয় করে দিয়ে গেল। দিয়ে গেল ভয়ঙ্কর আঘাত। বিচিত্র এই পৃথিবী। বিচিত্র তার মানুষের মন। বড় জটিল এ মনের গতি। যার মৃত্যুতে সুখী হবার কথা, তার মৃত্যুতেই শোকে মানুষ হয় পাথর। Nobody can ever knoes where the mind goes on or stay or what it wants.

নিঃসঙ্গতাই যার সঙ্গী
তাকে সঙ্গ দেবে কে?

মানুষ বড় নিঃসঙ্গ। তার জন্ম নিঃসঙ্গ। তার কর্ম নিঃসঙ্গ। মৃত্যু নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ তার জীবন। নিঃসঙ্গতা দিয়েই শুরু। নিঃসঙ্গতাতেই শেষ। মাঝখানেও সে নিঃসঙ্গ সলতে। তেল থাকে। প্রদীপ থাকে। সলতে থাকে। থাকে সলতে উসকে দেবার লোক। কিন্তু সলতে জ্বলে একাকী-ই। নিঃসঙ্গ। বড় নিঃসঙ্গ লাগছে তপনেরও। তবুও যুদ্ধে যেতে হবে। Struggle is life. Life is a battle. সংগ্রাম পরের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম নিজের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম প্রতি মুহূর্তে।

যুদ্ধে কেটে গেল আরও কয়েকটি মাস। শেষ হলো রক্ত আর আগুনের খেলা। সম্ভ্রম আর সন্তানের লাশ পেরিয়ে এলো স্বাধীনতা। আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করল জেনারেল নিয়াজি। আকাশে উড়ল নতুন পতাকা। সবুজ জমিনে লাল সূর্য উঠল সুনীল আকাশে। ঘরে ঘরে আনন্দ। ঘরে ফেরার আনন্দ। কিন্তু তপনের মনে আনন্দ কই? কেন এ বিষণ্নতা? যুদ্ধ তো শেষ। মানুষ স্বাধীনতা পেল। তপন পেল কী? সুকান্তর সেই বিখ্যাত কবিতাটা মনে পড়ল তার–

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা
যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য
নিজের ঘরে জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।

প্রশ্ন তার– কী পেল সে? কী দিয়েছে যুদ্ধ তাকে? একরাশ ঘরপোড়া ছাই, রক্তের প্লাবন আর লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রমের অপমৃত্যু ছাড়া কী আছে এ বিধ্বস্ত দেশে। এরই জন্য কি সে যুদ্ধ করেছে? আজ তার স্বজনেরা কোথায়? শ্যামলী কোথায়? জীবিত না মৃত? বিন্দু? তার বাবা-মা? সবার জন্য মনটা কেমন হু হু করে ওঠে। যুদ্ধ কি শুধু একরাশ শোকই পারে দিতে? যুদ্ধে যুদ্ধে এতদিন কারও কথাই মনে হয় নি। মনে পড়ায় মুষড়ে গেল ভেতরটা। কে জানে সব শেষ কি না? এরচেয়ে যুদ্ধই ছিল ভালো। স্মৃতি সুযোগ পায় নি মাথা তোলার। বেরিয়ে পড়ল তপন। তার নিজগ্রামে সে যাবেই। খুঁজবে সে যাদের ফেলে এসেছিল একদিন পথের ধারে অবহেলা ভরে। তাদেরই এখন আবার সবচেয়ে প্রিয় মনে হয়। একদিন ঘৃণা করেছিল সে শ্যামলীকে। কে জানে আজ সে কোথায়, কেমন আছে? খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে তাকে। কে জানে সে বসে আছে কিনা এতদিন পথ চেয়ে? নাকি সত্যিই বিয়ে করেছে সবুজকে? নানা প্রশ্ন জাগে মনে। আশ্চর্য! তবু ঘৃণা জাগে না কারও প্রতি। সকলকেই খুব কাছেই মনে হয়। আপন মনে হয়। সকলকেই কাছে পেতে ইচ্ছে হয়।

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে

যাই চলে যাই মুক্তি সুখে।।

যুদ্ধ যেন সব অচেনা করে দিয়ে যায়। বাস থেকে নামল তপন। মুখভর্তি দাড়ি। কাঁধে রাইফেল। গায়ে কড়া সৈনিকের পোশাক। মাইল দুই হেঁটে তারপর পৌঁছবে নিজ গ্রামে। পথের দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়। বড় বড় ঘাস, কাঁটা গাছ, যশুরে লতা, তেলাকুচু লতা ইত্যাদির জঙ্গল। মনে হয় এই পথে কোনোকালে হাঁটে নি কোনো পথিক। খুব বেশি লোক চলাচল করে না এখন এ পথে। স্মৃতির গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলছে তপন। কেমন শ্মশান শ্মশান। যেখনে বড় বড় বাড়ি ছিল, সেখানে ঘর পোড়া ছাই। জীবনও যেন ছাই হয়ে গেছে ওখানে। অথবা পলাতকা হরিণীর মতো পালিয়ে গেছে অন্য কোথাও। মা-বাবার জন্য কেমন করে মনটা! কে জানে কোথায় আছে? বেঁচে আছে, না মরে গেছে? দেশে না বিদেশে? আনমনে ভাবছে আর হাঁটছে দু'দিকে তাকাতে তাকাতে। দূরে দু'টো লোক। এ বেশে তপনকে দেখে চিনতে পারল না তারা। ভয়ে লুকিয়ে পড়ল। ঝোপের আড়ালে। গ্রামের এখনও যারা দু'চার জন পড়ে রয়েছে, পালিয়ে রয়েছে, মমতা ত্যাগ করে চলে যায় নি, এ দু'জন তাদের দলের। তপন দেখে ফেলেছে এবং চিনতে পারল। একটি মৃত্যুঞ্জয়। অন্যটি ধনঞ্জয়। এরা ভীরু, কাপুরুষ। জগাইর এককালের শিষ্য। Cowards die many times before death. জীবনভয়ে যুদ্ধে যায় নি এরা। স্বাধীন হবার খবরও হয়ত শোনে নি। আর তাই রাইফেল কাঁধে আগন্তুককে দেখে পালাচ্ছে। হঠাৎ একটা দুর্বুদ্ধি এলো মাথায়। ভাবল– একটু ভয় দিয়ে দেখা যাক কেমন হয়। কাছাকাছি গিয়ে মুখ গম্ভীর করে চেঁচিয়ে উঠল– হ্যান্ডস্ আপ্। ভয়ে প্রায় মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল দু'জন। রাইফেলের এক ধারাল নল তাক্ করা তাদের দিকে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল তারা। মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাক্ করা রাইফেল। ভয় দেখানোর জন্য তপন বলল–

– দুশ্মনকো খতম করে দেগা।

বলেই ট্রিগারে চাপ দিল। দ্রাম করে এক শব্দ হলো। মুহূর্তে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল মৃত্যুঞ্জয়ের বুক থেকে। একটা চিৎকার দিয়ে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল মৃত্যুঞ্জয়। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল ধনঞ্জয়। তপন স্মৃতি রহিত। কী হলো, বুঝতেই পারল না। সংবিধৎ ফিরে পেল কয়েক মুহূর্ত পর। দেখল– সামনে মৃত্যুঞ্জয়ের লাশ। রক্তাক্ত। নিথর। হঠাৎ তার মনে হলো– এ কী করেছে সে? ম্যাগাজিন ভর্তি বুলেট ছিল। বন্ধ ছিল না চাবি। তা খেয়াল ছিল না তার। ভুলের কৌতুকে একটা জীবন হলো নষ্ট। সে না আদর্শের সৈনিক? সে না মুক্তিযোদ্ধ? সারাজীবনের পুণ্যের সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে এক মুহূর্তের পদস্খলনে। যুদ্ধের সমস্ত পুণ্যকে পিষ্ট করেছে সামন্য ভুল। কী এক পাপ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী ছিঁড়ে দেহের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। কে যেন প্রবলবেগে দুই মুঠি দিয়ে চেপে ধরেছে ফুসফুস। হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ করেছে জ্বলন্ত শলাকা। সহসা সংবিৎ ফিরে পেল সে– এক মুহূর্তও আর এখানে থাকা নিরাপদ নয় তার জন্য। পেছন ফিরে সে আবার দ্রুত পা চালাল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। বিবেক বিদ্ধ করে তাকে পেছন থেকে। পারে না যেতে। আড়ষ্ট হয়ে আসে পা। পায়ে পা যায় জড়িয়ে। কিন্তু উপায় কী? পথ হয় ভুল। ভুল হয় পদক্ষেপ। তবুও চলে। মাঝে মাঝে তাকায় পেছন ফিরে। না। কেউ অনুসরণ করছে না। তাকে। কেউ না। ভীরু। Coward এর দল? বড় কষ্ট হয় তার– গ্রামের লোকেরা কেন তাকে নিঃশেষ করে ফেলে না পিটিয়ে? পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। চাচ্ছে না এভাবে চলে যেতে। কিন্তু তবুও তাকে ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আর পেছন পেছন যেন কে তাকে অনুসরণ করছে অন্ধকারের প্রেতাত্মার মতো।

চৈতন্য জ্বালে মশাল। পোড়ে অন্ধকারের ঝুল। উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলে তপন। গন্তব্য অজানা। পেছনে পড়ে থাকে আশা ও বেদনার স্মৃতির প্রান্তর। তপন ভাবে কী অর্থহীন এ বাঁচা? যার জন্য, যাদের জন্য যুদ্ধ করা, আজ তারা নেই। মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র স্বাদটুকুও তেতো করে দিল সমান্য একটা ভুল। সারাজীবন তাকে অশুভ দুষ্ট গ্রহের মতো বহন করে চলতে হবে এই ভয়ঙ্কর স্মৃতি। সামান্য একটু ভুল, সামান্য একটু কৌতুক, সামান্য একটু তামাশা, সামান্য একটু অসচেতনতা কত মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাতে পারে? গ্রাম থেকে পালিয়ে এলো তপন। কিন্তু পালাতে পারল না নিজের কাছ থেকে। নিজেই যখন নিজের শত্রু হয়ে ওঠে কেউ, নিজেই যখন হয়ে যায় নিজের করা কোনো পাপের সাক্ষী, প্রতি মুহূর্তে তখন নিজকে চোরচোর মনে হয়। মনে হয় ধরা পড়ে গেছি। আসলেই সে ধরা পড়ে যায় নিজের কাছে। প্রত্যেক মানুষই ধরা পড়ে। অন্যের কাছে পেলেও নিজের কাছে সে রেহাই পায় না।

পথ চলে তপন। কোথায় যাবে সে। জানে না। গন্তব্য অজানা। ভাবল– আর দেশে নয়। দেশের জন্য যে যুদ্ধ করেছে, এ সে নয়। এ নয় তার স্বপ্নের দেশ। সে তো চায় নি এ বিধ্বস্ত বাংলা? এই ছেঁড়াখোঁড়া দেশই কি তার স্বপ্নস্বর্গ? কোথায় সেই শ্যামলী? তার প্রাণের শ্যামলী? প্রেমের শ্যামলী? কোথায় তার স্বজন? বাবা, মা, ভাই, বোন? সর্বহারা স্বদেশ। স্বজন হারানো স্বদেশ। এই কী স্বাধীনতা? না এ স্বাধীনতার লাশ? ইচ্ছে তার, সে যাবে স্বজনের খোঁজে। পথে পথে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে খুঁজবে সে। খুঁজবে সে প্রত্যেক প্রদেশ। যদি দেখা পায়।

যাত্রী আমি ওরে

পারবে না কেউ রাখতে আমার ধরে।

গ্রাম পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলে তপন। গ্রাম ছেড়ে শহরে। শহর ছেড়ে অন্য শহর। তারপর ভারত। বর্ডার এলাকা উন্মুক্ত। লোকজন আসছে যাচ্ছে। তপন ভাবছে– এই তো ভালো! জমিতে বেড়া দিয়ে কি দেশ ভাগ করা যায়? দেশ ভাগ হবে ভাষায়, সংস্কৃতিতে। মুখের ভাষা মানুষের বাংলা। এদিকেও, ওদিকেও। অথচ বাংলা দুইটা? পশ্চিমবাংলা আর পূর্ববাংলা। স্বাধীন হলো বলে বাংলাদেশ। ভাষা এক সংস্কৃতি এক। অথচ দেশ দুইটা। দেশ বিভাজনের এই নীতি সে বোঝে না। তবে এটুকু বোঝে যে দেশ স্বাধীন হওয়া দরকার ছিল। একদেশ ডিঙিয়ে পাকিস্তানিরা শাসন আর শোষণ করত এদেশ। ভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের আলাদা। তারপরও ছিল একদেশ? এটা তার পছন্দ নয়। সে বর্ডার পেরিয়ে গেল ভাবতে ভাবতে।

প্রথমেই বনগাঁ 'মানা' ক্যাম্প। ঘুরল। খুঁজল। পেল না কাউকে। মনটা দমে গেল। যুদ্ধের প্রতি অসম্ভব ঘৃণা তাকে বিষাক্ত করে তুলল। ভাবল– যুদ্ধ কী দেয়? স্বাধীনতা? এ কেমন স্বাধীনতা? ডানাভাঙা পায়রাকে খাঁচা থেকে মুক্তি দিলে কী লাভ? এর চেয়ে খাঁচাই ছিল ভালো। আকাশ না থাকলেও ডানা তো ছিল? যুদ্ধ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বিধ্বস্ত করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় সুখ, শান্তি। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। ধর্ষিত হলো লক্ষ লক্ষ মা-বোন, এর কী হবে? এদের কী হবে? কে তাদের ফিরিয়ে দেবে সে জীবন, সে সম্ভ্রম? হঠাৎ তার শ্যামলীর কথা মনে হলো, বিন্দুর কথা মনে হলো, মনে হলো তার মায়ের কথা। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তারাও কি ধর্ষিতা? একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রেমিকা? একজন মুক্তিযোদ্ধার মা? হতেও তো পারে? আর ভাবতে পারে না তপন। ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করে। যুদ্ধ করেছে সে। কই তার মা, বাবা, ভাই, বোন, প্রেমিকা? সবহারা তপন কী পেল যুদ্ধ করে? সুন্দর স্বাধীন একটা দেশও কি পেল? পেল পোড়া কাগজের মতো এক রুক্ষ দেশ। হাতের অস্ত্র ফেলে দিল ট্রেনের নিচে। ঘৃণা করে সে যুদ্ধকে। ঘৃণা করে। ঘৃণা করে নিজেকে পরিচয় দিতে একজন যোদ্ধা হিসেবে।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে তোমায় দেখবে বলে

হে আমার আগুন তুমি এবার ওঠো জ্বলে॥

দমদম জংশন। কয়েকদিন কেটে গেল। দেখা হলো স্বল্প পরিচিত দু'একজনের সাথে। কেউ তার প্রিয়জনের খোঁজ পারল না দিতে। যুদ্ধ সে মানুষের ঠিকানা মুছে দেয়। মুছে দেয় স্মৃতি। এ গলি, সে গলি খুঁজেও ফল হলো না কোনো।

সে ভাবছে– উড়িষ্যা, বিহার কিংবা আন্দামানেও তো শরণার্থী পাঠানো হয়েছে। এত খুঁজে কি পাওয়া যাবে? কাকেইবা সে খুঁজছে? বাবা? মা? শ্যামলীকে? বাবা-মা তো তাকে ত্যাগই করে দিয়েছে? তাহলে? শ্যামলীকে? শ্যামলীও তো? কী হবে তাকে খুঁজে? সেও তো তাকে ত্যাগ করে গেছে? কোন্ শ্যামলীকেইবা খুঁজবে এখন? যে শ্যামলীকে সে জানত, সে তো নেই আর। ও তো ভিন্ন শ্যামলী? খুঁজেইবা কী করবে? কী করবে তাকে নিয়ে? তবুও কী এক আকর্ষণে খুঁজে চলে তপন। খোঁজে শ্যামলীকে। খোঁজে বিন্দুকে। বাবা-মা স্বজনদের। ভাঙা বোতলের টুকরোর মতো যুদ্ধ বিছিন্ন করে দেয় সমাজ, সংসার, স্বজন। ছিটকে যায় কে কোথায়?

লবণহ্রদ ক্যাম্পে এসে পৌঁছাল তপন। খুঁজল অনেক। মিলল না। কে কাকে চেনে? কে রাখে কার খোঁজ? অবশেষে ক্লান্ত, বিষণ্ন, বিধ্বস্ত তপন ভাবে– চলে যাবে দূরে কোথাও। দেরাদুন। তামিলনাড়ু। নয়ত আন্দামান। থাকবে পড়ে সমাজের এক কোণে। কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না তাকে। যেখানে বাধবে না কোনো পরিচিত মানুষ। যে দেশের জন্য যুদ্ধ করে তার সব হারিয়েছে, সে দেশ থেকে দূরে। বহুদূরে। অচেনা জায়গায় গিয়ে কাজ করে খাবে। ফিরবে না সে আর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই বাংলায়। যেখানে তার শ্যামলী নাই, স্বজন নাই, কী আশায় ফিরবে সে সেখানে? ধুমকেতুর মতো ছুটে বেরিয়ে এলো ক্যাম্প থেকে। চলে এলো স্টেশনে। গাড়িতে চলে যাবে কোলকাতা। সেখানে থেকে জাহাজে আন্দামান দ্বীপে। আর ফিরবে না। টিকিট কাটা পয়সা নেই হাতে। কীসের টিকিট? প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল গাড়ির অপেক্ষায়। মাইকে বাজছে গান– 'তুম্ বিন জীবন, ক্যায়েসে জীবন।'

কেমন যেন ভেতরটা হাহাকার করে উঠল তপনের। মনে হলো– মরুভূমির লু-হাওয়া যেন সমস্ত উত্তপ্ত মরুবালুকে উড়িয়ে নিয়ে এলো তপনের হৃদয়ের প্রান্তরে। এমন কেন হয়? কেন কোনো একজনের জন্য নিজের সমস্ত জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়? কেন মনে হয় তুমি ছাড়া জীবন কীসের জীবন? কেন মনে হয় 'জীবনে আজ তুমি নেই তাই জীবনের কোনো দাম নেই?' মন কেন এরকম হয়? তাহলে কি না পেলেই পাবার আশা প্রবল হয়?

লোকজনের ভিড়। ঠেলাঠেলি। ভালো লাগছিল না তপনের। সরে এক পাশের দিকে দাঁড়াল। এত লোক ছুটছে কীসের অন্বেষণে? সবাই-ই কি তপনের মতো প্রিয়জন খুঁজছে? তপন চেষ্টা করল তাদের মুখে হৃদয়ের পাঠ পড়তে। পারল না। নানা রকমের মানুষ। বিচিত্র তাদের অভিব্যক্তি। তার ভেতর তপন খুঁজছে চেহারার মিল। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তপন। ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। মনে হলো– মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে বুকের মাঝখানে নেমে এলো ঠাণ্ডা একখণ্ড বরফ। হৃৎপিণ্ডে গেল আটকে। চিনতে তার ভুল হয় নি একটুও। যদিও ময়লা জমেছে তার চেহারায়, গায়ের নোংরা ছেঁড়া শাড়িটার রঙ বিবর্ণ। তবুও বোঝা যাচ্ছে ও শ্যামলী। শাড়িটা তার সবুজ ছিল। সোনায় শ্যাওলা জমলেও চিনতে ভুল হয় না স্বর্ণকারের। একটু ঘষলেই আসল রূপটি পড়ে বেরিয়ে। তপন চিনতে পারে– এ শ্যামলী। তর সয় না তার।

দেখে ব্রিজের নিচে ভাঙা টিনের কৌটায় কাগজে আগুন জ্বেলে ইঁটের উপর কী যেন ফুটাচ্ছে। কোলে একটা বাচ্চা চুষছে তার বুকের মাই। ভরাবুক এখন শুকনো। চোখ কোটরাগত। দু'গালে টোল। গলার হাড় বেরনো। ছেঁড়া শাড়ির ফাঁকে মলিন গতর। চোখে মরুর দৃষ্টি। এ কী চেহারা শ্যামলীর? কোলে ও কার বাচ্চা? তপনের? আবার মনে হলো– সবুজের না তো? তপন ভাবল– সন্তান পিতার। সন্তান সন্তানই। ও সন্তান কার আবার, তার? উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারে না।

ডাক দেয়– শ্যামলী?

হঠাৎ যেন মরুর দৃষ্টিতে ঝপ্ করে বৃষ্টি হলো একঝাঁক। কেঁপে উঠল শিশুসহ মেয়েটি। নাকি তপনের দেখার ভুল? তাকাল তপনের দিকে। আবার ডাকল তপন– শ্যামলী, আমি এসেছি। যুদ্ধ শেষ।

চোখ নামিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি।

হতাশ হলো তপন। ওরকম করল কেন শ্যামলী?

সংশয় হয় তপনের– ও কি শ্যামলী?

যদি না হয়, তবে কার জন্য সে যুদ্ধ করেছে?

মুষড়ে গেল মনটা তপনের। এত পাবার আশা যাকে, তাকে দেখে এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল আকর্ষণ।

শ্যামলী কথা বলল না কেন? তবে কি চিনতে পারে নি?

যুদ্ধ কি মানুষের চেহারাও ভুলিয়ে দেয়? কণ্ঠস্বরও কি ভুলিয়ে দেয়? দপ্‌দপ্ করতে লাগল তার মাথার শিরা। বাচ্চাটার মুঠোবদ্ধ হাতটা শূন্যে উত্তোলিত হচ্ছে। আবার নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো– ও বাচ্চা কার? পাক হানাদার বাহিনীর নয় তো? অসম্ভব কিছুই নয়। শেষে কিনা এই হলো? এ কারণেই বুঝি ফিরেও তাকায় নি শ্যামলী? শ্যামলীর কী দোষ? বাচ্চাটাকে শেষ করে দাও। না, বাচ্চারই বা কী দোষ? তবে দোষ কার? যারই হোক– এ কার বাচ্চাকে তারা লালন করবে? মাথার ভেতর দাউদাউ করে

চিতা। ও যেন শ্যামলীই হয়? জেনে নেবে সব। কিন্তু কী জানবে? কিছুই ভেবে কূল পায় না তপন। ভাবে– শ্যামলীতো? আবার ডাক দেয়– শ্যামলী?

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে ঢাকা পড়ে যায় একজন মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠস্বর। হঠাৎ হুইসেল বাজিয়ে একটা গাড়ি এসে প্রবেশ করল স্টেশনে। দাঁড়াল দু'জনের মাঝখানে। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না তপন। বাংলাদেশের মতো দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল তার বুক।

#